মুক্তি সংগ্রামে পূর্ব বাংলা

শফিকুল হাসান

মুক্তির সংগ্রামে পূর্ব বাংলা

শফিকুল হাসান

বইর নাম........................
লেখক........................
ভাষা........................
বইর প্রকার........................
ক্রয়ের তারিখ........................

রঞ্জন প্রকাশনী

৬১, মটলেন

কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

জীবন যাদের নির্দয়ের দয়ার উপর নির্ভরশীল,
ভাগ্য যাদের নিষ্ঠুরের হাতের খেলার ঘুঁটি,
হৃদয় যাদের কেবলই পেয়েছে লাঞ্ছনা!
আজ এই বিপ্লবী ক্ষণে—
তাদের মাঝে তীব্র হয়ে জ্বলে উঠুক
প্রতিহিংসার আগুন!
আর তা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ুক
প্রতিটি সর্বহারা শোষিত মানুষের অন্তরে।

২৮শে মার্চ, ১৯৭১

—লেখক

প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৭৮
প্রকাশক : রবীন মুখোপাধ্যায়
৬১, মটলেন কলিকাতা-১৩
মুদ্রক :
অজয় দাশগুপ্ত
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-১৩
মূল্য : আড়াই টাকা

ভূমিকা

এই গ্রন্থের লেখক শ্রীশফিকুল হাসানের সঙ্গে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় আমার প্রথম দেখা হয়। সে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ২৭শে মার্চের পর ঢাকা থেকে রওনা হয়ে সে পাবনা হয়ে কলকাতায় এসেছিল। ২৫শে মার্চের পর থেকে ঢাকা এবং পূর্ব বাংলার অন্যত্র সৈন্যবাহিনীর বীভৎস অত্যাচারের বহু বিবরণ ইতিপূর্বে আমি শুনেছি ও পড়েছি। শফিকের কাছ থেকেও কিছু কিছু শুনলাম। কিন্তু যা তার কাছ থেকে প্রথম শুনলাম এবং যে সব তথ্য আমাদের কাছে নতুন তা হল পূর্ব বাংলার বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির অতীত ও বর্তমান কার্যকলাপ।

তখন তাকে আমি এই সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে দর্পণে লেখার জন্য অনুরোধ করি। প্রথম সে একটি দীর্ঘ লেখা আমায় দেয়। সেটি আমি তিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করি। তারপর তার আরও কয়েকটি লেখা দর্পণের বিভিন্ন সংখ্যায় এবং একটি লেখা জাগৃহি নামে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শেষ লেখাটি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

দর্পণে প্রথম লেখা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর চিঠিপত্র আসতে থাকে। পক্ষে এবং বিপক্ষে। তার কারণ পূর্ব বাংলার বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে এখানকার কমিউনিস্টরা এবং সাধারণভাবে রাজনীতি-সচেতন জনসাধারণ বিশেষ কিছু জানতেন না। পশ্চিমবঙ্গের এম-এল পার্টি মুজিবর রহমানকে মার্কিনী দালাল বলে দায়মুক্তির স্বস্তিশ্বাস ফেলেছিল। তাদের বিভিন্ন ইস্তাহারে দেখেছি ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর লড়াইকে মুক্তি যুদ্ধ আখ্যা না দিয়ে বলা হয়েছে হক-তোহার পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-র নেতৃত্বেই আসল বিপ্লবী যুদ্ধ চলছে। শফিক অনেক তথ্য দিয়ে এই বক্তব্যের পাল্টা বক্তব্য হাজির করেছে। তবে বিভিন্ন সময়ে তার সঙ্গে আলোচনার সময় শফিক একটা কথা স্বীকার করেছে যে, পূর্ব বাংলার সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিই পশ্চিমবঙ্গের এম-এল পার্টি সম্পর্কে মোহগ্রস্ত ছিল। এমন কি সব পার্টিই চারু মজুমদারের স্বীকৃতি পাবার জন্য লালায়িত ছিল। এখানে এসে তাদের মোহভঙ্গ

হয়েছে। অনেকে পরিষ্কার বলেছে, এখানে এসে দেখছি এম-এল পার্টি মোটেই বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত নয়। অনেকে বলে গেছে আমরা দেশে ফিরে গিয়ে এই সম্পর্কে প্রচার চালাব।

শফিকও ফিরে গেছে। প্রথমে সে যাবে ঢাকায়। তারপর কয়েকটি জেলা ঘুরে তার চট্টগ্রামে পৌঁছবার কথা। জানিনা সে ঢাকায় পৌঁছেছে কিনা।

হীরেন বসু

নিবেদন

আমি সাহিত্যিক নই, নিছক সাহিত্য রচনার প্রয়োজনেই এই প্রবন্ধগুলো আমি রচনা করিনি। পূর্ব বাংলার জনগণের রক্তস্রোতে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক গোষ্ঠী আজ রক্তকেলিতে মত্ত ; পূর্ব বাংলার সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণের হিংস্র থাবা আজ সর্বহারা জনগণের প্রতি আক্রমণে প্রসারিত ; সাম্রাজ্যবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের রক্তলোলুপ বিকশিত দন্ত আজ মুক্তিকামী জনগণকে গ্রাস করতে উদ্যত। এক কথায় পূর্ব বাংলাকে নিয়ে বিশ্ব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সুপরিকল্পিত এক জুয়া খেলা আরম্ভ করেছে। এমনি এক বিশেষ সঙ্কটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনগণের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম যাতে সঠিক মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী পথে পরিচালিত হয়ে সামগ্রিক বিজয় অর্জনে সমর্থ হয়, প্রতিক্রিয়াশীলরা যাতে জনগণের সৃষ্ট সংগ্রামী ইতিহাসকে বিকৃত করতে না পারে, বাস্তব ও সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ বর্তমান সংগ্রামী ইতিহাস থেকে জনগণ যাতে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে বিপ্লবী কর্মে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধ কয়টি পূর্ব বাংলার জনগণের সামনে তুলে ধরছি। এই ব্যাপারে আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা, মৌলিকত্ব ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই আমি প্রাধান্য দিয়েছি। আমার প্রচেষ্টা কতটুকু সাফল্য লাভে সমর্থ, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সংগ্রামী ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা পূর্ব বাংলার বীর বিপ্লবী জনগণ একে বিপ্লবের ক্ষেত্রে কতটুকু সৃজনশীল ভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে দর্পণের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় হীরেন বসু এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় চাণক্য সরকারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া শ্রদ্ধেয় ধ্রুতীন চক্রবর্তী, সমর সেন, সুমন্ত সেন, রণেন নাগ, নির্মল দাসগুপ্ত, হীরেন্দ্র চক্রবর্তী, অনিল রায়, অনিল ভট্টাচার্য, অসীম মুখোপাধ্যায় রফিকুল ইসলাম, শাহানা আফরোজা এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী কমরেডদের প্রেরণা সহযোগিতা আমার রাজনৈতিক বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে তুলতে প্রভূত সহায়তা করে। শ্রদ্ধেয় প্রবীর বসু ও

বালিগঞ্জের কমরেড আমার লেখার যথাযথ গঠনমূলক সমলোচনা করে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে সহায়তা করেছেন। বন্ধু প্রকাশক রবীন মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত দান এ ব্যাপারে অপরিসীম। উল্লেখিত সকল শুভার্থী সহযোগীদের রাজনৈতিক ভাবেই জানাই সশ্রদ্ধ বিপ্লবী অভিবাদন।

পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় ও শ্রেণী সংগ্রামের বিপ্লবী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতিতে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সৃজনশীল ভাবে প্রয়োগশীল হলেই আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

বিপ্লবী অভিবাদনসহ
শফিকুল হাসান
২৫।১০।৭১

পূর্ববাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসিত পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রধানতঃ দুটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে জন্মেছিল। এদের মধ্যে প্রথমটি ছিল বামপন্থীদের নেতৃত্বে সর্বহারা, অর্ধ-সর্বহারা ও জাতীয় ধনিকদের সমন্বয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজিত করে স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতবর্ষ কায়েম করা। দ্বিতীয়টি হলো ভারতবর্ষের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের মুৎসুদ্দি ধনিক, জোতদার মহাজন ও আমলাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। স্বচ্ছ ও সঠিক রাজনৈতিক বক্তব্যের অভাবে, উপযুক্ত সংগঠন না থাকায় এবং নেতৃত্বহীনতার জন্য বামপন্থীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতবর্ষের সর্বহারা জনগণের আস্থা লাভে ব্যর্থ হয়। ফলে মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সমন্বয়ে গঠিত বামপন্থীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জনগণের মাঝে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। অপরপক্ষে ভারতবর্ষের বড় ধনিক, জোতদার মহাজন, আমলা ও তার দালালশ্রেণী নিজেদের মাঝে ক্ষমতা বণ্টন করে নেবার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জনগণকে ধর্মের খোলসে এই উভয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিপথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয় (অবশ্য এর জন্য উভয় দলকেই কয়েক দফা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে হয়)। স্বাধীনতা সংগ্রাম সশস্ত্র যুদ্ধের রূপ নিলে বামপন্থীদের হাতে ক্ষমতা চলে যেতে পারে এই ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শোষকেরা আপোষের পথে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভারতবর্ষকে পাকিস্তান এবং ভারত এ দুটি বিবাদমান রাষ্ট্রে পরিণত করে এবং উল্লিখিত দুই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এ ভাবেই ভারত ও পাকিস্তান সার্বভৌমত্বহীন তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ করে। ধর্মের আবরণে এই দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল এই দুটি রাষ্ট্রের জনগণের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে শোষণকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা, ধর্মের নামে জনগণের বিপ্লবী শক্তিকে দাবিয়ে রাখা এবং ধর্মের নাম করে অবাধে জনগণের উপর শাসন, শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়া। দুটি দেশের তথাকথিত এই স্বাধীনতা দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থকে পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখার এক ঘৃণ্য চক্রান্তের ফলমাত্র।

বামপন্থীদের দুরবস্থা

স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার প্রথম থেকেই ভ্রাতৃত্ব, সংহতি শক্তিশালী কেন্দ্র এবং সর্বোপরি ইসলামকে রক্ষার নাম করে জনগণের উপর শোষণ ও নিপীড়ন চালাতে থাকে। পূর্ব বাংলার জনগণের উপর এই শোষণ ও নিপীড়ন ছিল সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক। বামপন্থী দল হিসেবে কমিউনিষ্টরা যাতে এই শোষণ নিপীড়ন সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করে, তাদের শোষণ কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টির সমস্ত কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং মুসলীম লীগের গুণ্ডাদের ধর্ম রক্ষার অজুহাতে কমিউনিষ্ট নিধন-কার্যে নিয়োগ করা হয়। এই অকথ্য অত্যাচারের ফলে কার্যতঃ স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলায় কোন সুশৃঙ্খল বামপন্থী পার্টি গড়ে উঠতে পারেনি।

শোষণের রূপ

পূর্ব বাংলা একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এর প্রায় শতকরা আশি জনই কৃষক। উঠতি সামন্ত শোষক মুসলীম লীগের কর্মীরা রাষ্ট্রীয় সহায়তা নিয়ে নিরীহ কৃষক সমাজকে চরম ভাবে শোষণ করতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার সমাজ জীবনে গড়ে ওঠে জোতদার, মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার ও গ্রাম্য টাউট-বাটপাড় দালাল এবং বদ মাতব্বরদের রাজত্ব। মিথ্যা মামলা, সুদ ও ঘুষের দৌরাত্ম্যে কৃষকরা ধীরে ধীরে তাদের চাষের জমি হারাতে থাকে এবং ভূমিহীন বর্গাচাষী ও গরীব কৃষকে পরিণত হয়। এই ভাবেই শোষণ নিপীড়নের ফলে কৃষক তার জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুর, বেকার বা সর্বহারা শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে জোতদার, মহাজন, ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য এবং মুসলীম লীগ কর্মীরা তাদের গণবিরোধী কার্যকলাপ দ্বারা কৃষকদের জমি ছিনিয়ে নিয়ে আরো জমির মালিক হয়। এভাবে পূর্ব বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জমির মালিকানা অকৃষকদের হাতে চলে আসে এবং তাতে তাদের যে পুঁজি গড়ে ওঠে সে পুঁজি বিনিয়োগ করে এই জোতদার মহাজন শ্রেণীই ক্রমে ক্রমে পূর্ব বাংলার উঠতি পুঁজিপতিরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। এদিকে পাকিস্তানী সরকার বারোশ মাইল দূর থেকে ভ্রাতৃত্ব সংহতি ইসলাম শক্তিশালী কেন্দ্র এবং সর্বোপরি "শিশুরাষ্ট্রের" নামে পূর্ব বাংলার এই নির্যাতীত কঙ্কালসার মেহনতী জনতার উপর পূর্ণ মাত্রায় ঔপনিবেশিক শোষণ চালিয়ে যেতে

থাকে। এক পর্যায়ে এই শোষণের মাত্রা এত বেশী হয় যে বাহান্ন-তিপ্পান্ন সালে পূর্ব বাংলার জনগণকে ষোল টাকা সের দরে লবণ ও বাহাত্তর টাকা মণ দরে চাউল ক্রয় করতে হয়েছে। এমতাবস্থায় পূর্ব বাংলার জনগণের উপর জোতদার মহাজন দালাল বাটপাড়দের সামন্তবাদী শোষণ, পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শোষণ এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, পুর্ব বাংলার ও পাকিস্তানের একচেটিয়া ও বড় পুঁজির শোষণ এবং সরকারী আমলা অফিসারদের শোষণগুলিই পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট দ্বন্দ্ব হিসাবে বিরাজ করতে থাকে।

ভাষা আন্দোলন

শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তিকামী পূর্ব বাংলার জনগণের মনে ক্রমশ বিক্ষোভের জন্ম হয়, তাদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। জনতা তাদের ব্যক্তিগত সামাজিক রাজনৈতিক ও বৈষয়িক অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হতে শুরু করেন। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এই গণ-বিক্ষোভ ও গণ আন্দোলনকে প্রতিহত করতে এক কলঙ্কময় ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের বুক থেকে জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর অস্তিত্বকে মুছে দেবার এক ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রথম কার্য হিসেবে দেশের ছাপান্ন ভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। সমগ্র পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতা এই গণবিরোধী আক্রমণের বিরুদ্ধে এক ঐতি-হাসিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। পূর্ব বাংলার ইতিহাসে সেই আন্দোলন "৫২ সালের ভাষা আন্দোলন" নামে খ্যাত। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার আপামর জনতা, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তৎকালীন ছাত্রনেতা পাবনার আব্দুল মতিন ও গাজীউল হকের নেতৃত্বে এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও তার দালালরা এই উত্তাল জনতার দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী এক গণমিছিলের উপর গুলি চালিয়ে অমানুষিক বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করে ভাষা আন্দোলনের বীর সেনানী শহীদ সালাম জব্বার রফিক ও আরো অনেককে। পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনতা সেদিন পিশাচদের হিংস্র থাবার আঘাতে দাবী ত্যাগ করেনি, বুকের রক্তে রাজপথে রাঙ্গিয়ে তারা তাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, জয়ী হয়েছিল। শোষক ও শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়েছে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে স্বীকার করে নিতে। পূর্ব বাংলার বীর জনগণের

এই বিজয় ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়—যা এসেছিল রক্তরাঙ্গা পিচ্ছিল পথ ধরে। পরবর্তীকালে দেখা গেল বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও কার্যত এর কোন মর্যাদা দেয়া হচ্ছেনা, বরং ষড়যন্ত্রের আর এক ধাপ হিসেবে বাংলা অক্ষরকে আরবী বা রোমান অক্ষরে পরিবর্তিত করার অপর এক নূতন চক্রান্তে তারা লিপ্ত। জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ভাষার উপর এ ধরণের জঘন্য আক্রমণকে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করেন।

বিমাতাসুলভ ব্যবহার

পাকিস্তানের শাসক ও শোষক গোষ্ঠী অতঃপর পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে নানাপ্রকার বিমাতাসুলভ ব্যবহার শুরু করে। সেনাবাহিনীতে, সরকারী আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরীর ক্ষেত্রে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, আমলা অফিসার বিনিয়োগ ক্ষেত্রে, শিক্ষার খাতে, স্বাস্থ্য রক্ষার খাতে উন্নয়ন খাতে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণকে বঞ্চিত করা হয়। বিশেষ করে শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে চরম বাধার সৃষ্টি করা হয়। দ্রব্যমূল্যে দুই দেশের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রচিত হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের উপর কর ও শুল্কের বোঝা বাড়িয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রতিপালনের দায়িত্ব জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আরো বড় ধনিক পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত ভাবে পূর্ব বাংলার সকল কুটিরশিল্পগুলিকে ধ্বংস করা হয়। ফলে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগের প্রতি গণমনে আস্থাহীনতা জন্মে এবং মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫১ সালে "নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরে এই নাম বদলে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ রাখা হয়।

দাঙ্গা ষড়যন্ত্র

অপর দিকে শেরে বাংলা ফজলুল হক "কৃষক শ্রমিক পার্টি" নামে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম দেন। এ সময় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টরা হাজী দানেশ, ফজলুল করিম, মণি সিং দেবেন শিকদার ও ছাত্র নেতা আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে "গণতন্ত্রী দল" নামক একটি বামপন্থী রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই তিনটি রাজনৈতিক পার্টি যুক্তফ্রন্ট নামে প্রাদেশিক পরিষদে মুসলীম লীগকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী

স্বার্থবাদীরা আদমজী শিল্প এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধায় এবং ৯২ (ক) ধারা জারী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। পূর্ব বাংলার গণরায়কে বাতিল করার জন্য তৎকালীন কুখ্যাত ইস্কান্দার মির্জা সরকার ঢাকার জনগণকে ট্যাঙ্ক ও কামান আক্রমণের পথ নিয়েছিল। পরে আপোষের মাধ্যমে শহীদ সারওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে কেন্দ্রের দালাল সরকার হিসাবে ক্ষমতা দান করা হয়। প্রগতিশীলরা এই সব ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করে। এই ন্যাপকে কেন্দ্র করেই কমিউনিষ্টরা ১৯৫৬ সালে পূর্ব বাংলার শহর ও গ্রামের জনগণের নিকট তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী তুলে ধরেন। পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত ধনিকরা আওয়ামী লীগেই অবস্থান করতে থাকে।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতা পাবার দীর্ঘ নয় বছর পর ১৯৫৬ সালে শোষকগোষ্ঠী একটি তথাকথিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। ইসলামের নাম করে সে শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার জনগণকে শোষণ করার বিভিন্ন কৌশল লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল মাত্র। জনগণ এই শাসনতন্ত্র তীব্র ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সারা দেশ অরাজকতা, বিশৃংখলা, চুরি ডাকাতি, সুদ ঘুষ ও চোরাকারবারে ছেয়ে যায়। ১৯৫৯ সালে নির্বাচনের আশায় জনগণ যখন উন্মুখ ঠিক তেমনি সময়ে পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীলদের অন্যতম প্রতিনিধি শঠ চূড়ামণি আইয়ুব খাঁন ১৯৫৮ সালের সাতাশে অক্টোবর সামরিক আইন জারী করে ক্ষমতা দখল করে নেয়। এ ভাবে পদে পদে শাসক ও শোষকরা জনগণের বাঁচার প্রতিটি দাবীকে বিভিন্ন কলাকৌশলে উপেক্ষা করে সমগ্র জাতির উপর দীর্ঘদিন ধরে চালিয়েছে অকথ্য লাঞ্ছনা, নির্মম নিষ্পেষণ এবং পদে পদে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে করেছে বঞ্চিত। দীর্ঘ এক যুগ ধরে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর আয়ুবশাহীর ঘৃণ্য নির্যাতন সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক প্রভুদের নিকট প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত অধিকার দাবীর বিনিময়ে পূর্ববাংলার জনগণ কেবলই পেয়েছে বুলেট বেয়নেট আর অকথ্য নির্যাতন।

গণ অভ্যুত্থান

এই লাঞ্ছিত নিপীড়িত পূর্ববাংলার জনগণ মার খেতে খেতে সংগ্রামমুখী বিপ্লবমুখী হয় এবং ১৯৬৫ সাল থেকেই কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে জাতীয়

মুক্তিরর জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার সামন্ত ধনিক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ এ সময় কেন্দ্রের নিকট ছয় দফা নামে একটি আপোষ চুক্তি তুলে ধরে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এই আপোষ রফাকেও বাড়াবাড়ি মনে করতে থাকে এবং ছয় দফার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমানকে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামক এক চক্রান্তমূলক মামলায় যুক্ত করে বিচারের জন্য সামরিক আদালতে প্রেরণ করে। ইত্যাদি ধরণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জনগণ বিশেষ করে শ্রমিক ও ছাত্র সমাজ এক প্রচণ্ড গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। আইয়ুবের জঙ্গিবাহিনীও ঢাকার পথে সান্ধ্য আইন জারি করে উনিশশ সত্তরের বিশে জানুয়ারী চালিয়েছে রাইফেল, ষ্টেনগান মেশিন গান, হত্যা করেছে কমরেড আসাদুজ্জমান রুস্তম, মতিউর, হাসানুজ্জামান, জানুমিয়া ও আরো অনেক নাম না জানা শহীদদের। প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ মুজিব এক আপোষ চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি পান এবং "গোল টেবিল" নামক এক আপোষ আলোচনায় লিপ্ত হন। গোলটেবিল জনগণকে কিছুই দেয় নি, বরং শেখ মুজিব সহ গণবিরোধী স্বার্থান্ধ নেতাদের এই আলোচনামূলক বিশ্বাসঘাতকতায় গণ অভ্যুত্থানকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়। জনগণের মনে চাপা আক্রোশ ভিসুভিয়সের ন্যায় প্রতিনিয়ত জ্বলতে থাকে।

এই রুদ্র রোষে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখে আইয়ুব সরকারের সিংহাসন পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে নব জল্লাদ নরপিশাচ ইয়াহিয়ার দ্বিতীয়বার সামরিক আইন ঘোষণার মাধ্যমে। ক্ষমতা হাতে পেয়েই এই নরপিশাচ একজন আদর্শ গণতন্ত্রী ও ভালো মানুষের ছদ্মবেশে ঘোষণা করেন তিনি দেশে সুখ শান্তি ফিরিয়ে দেবেন, গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন এবং তার কথানুযায়ী তিনি নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করেন। তার এই ঘোষণাকে পূর্ব বাংলার সামন্ত ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ, দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মস্কোপন্থী ন্যাপ, প্রতিক্রিয়াশীল তিনটি মুসলীম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পি ডি পি ও কৃষক শ্রমিক পার্টি স্বাগত জানায়। এসব পার্টির কর্মকর্তারা ইয়াহিয়া খানের গণতন্ত্রী (?) কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অপরদিকে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্টরা "জাতীয় মুক্তি নির্বাচনে আসতে পারে না, বিশেষতঃ

সামরিক শাসন চলাকালীন নির্বাচন, যেখানে ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণের কোন স্থান নেই সে বুর্জোয়া নির্বাচন কোন ক্রমেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন হতে পারে না" বলে অভিমত প্রকাশ করে এবং গণতন্ত্রের নামে এই প্রহসনকে প্রতিহত করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

গত ১৯৭০ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারী পল্টনের এক বিরাট জনসভায় কমরেড মাহাবুব-উল্লার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলাকে একটি "স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র" হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং এই নূতন রাষ্ট্রের কাঠামো এবং রূপরেখা সম্বন্ধে এগারো দফা সম্বলিত একটি বাস্তব কর্মসূচী জনগণের নিকট তুলে ধরা হয়। এই কর্মসূচী বাস্তবে প্রয়োগ বিধির প্রশ্ন ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক কারণে এক্ষণে কমিউনিষ্টদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তাঁরা কতগুলো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

(১) হক তোয়াহা গ্রুপ। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম এল) নাম দিয়ে এঁরা পাকিস্তান ভিত্তিক কৃষি বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্তবাদী দেশ পূর্ব বাংলায় কৃষি বিপ্লব অপরিহার্য, কিন্তু বর্তমানে পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানী অত্যাচারী সেনাবাহিনীর (যাদের জনগণ বিদেশী অনুপ্রবেশকারী সেনাবাহিনী বলে মনে করেন) ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে বজায় রেখে কৃষি বিপ্লব, বিশেষতঃ পাকিস্তান ভিত্তিক কৃষি বিপ্লব (সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) সমাধা করা সম্ভব কি? পূর্ব বাংলার জনগণ যখন শোষণ, শাসন ও নিপীড়ন থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত তেমনি সময়ে "জনগণ ভুল করছে" এই অমার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তাঁরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। পক্ষান্তরে তাঁরা পূর্ব বাংলার জনগণ যে শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায় এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেছেন এবং পাকিস্তানের সংহতি কামনা করছেন। বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আধা সামন্তবাদী আধা ঔপনিবেশিক দেশ বিপ্লবপূর্ব চীনের জনগণ ও বিপ্লবীরা সামন্তবাদ প্রধান দ্বন্দ্ব থাকা সত্বেও জাপানী সেনাদের (যারা অনুপ্রবেশকারী ছিল) প্রথম বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে এমন কি চিয়াং কাইশেকের সঙ্গেও ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র যুদ্ধই কোন দেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে সফল করতে

পারে। মহান চীনের পথ আমাদের পথ—তাঁদের কার্যকলাপে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না। কৃষি বিপ্লবের কথা বললেও বাস্তবে তাঁরা তা করছেন না (যা করলে পূর্ব বাংলায় সামন্তবাদী শোষণের অবসান হতো) কেননা বিপ্লবের প্রথম ধাপ হিসাবে গ্রামে গ্রামে কৃষক বিশেষতঃ ভূমিহীন গরীব কৃষকদের রাজনীতিগতভাবে সচেতন করে তোলা ও আলোচনার মাঝে তাদের সংগঠিত করা প্রয়োজন. যা করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে খুলনা ও যশোরের কিছু অংশে তাঁরা কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও কোন লাল এলাকা বা ভিত্তি অঞ্চল গড়ে তুলতে সক্ষম হননি।

(২) সিরাজ শিকদার গ্রুপ। "পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন" নাম দিয়ে তাঁরা বলছেন, "পূর্ব বাংলা হচ্ছে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ, এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে উপনিবেশকে মুক্ত করতে হবে"। এ তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রেণী সংগ্রামকে বাদ দিয়ে তাঁরা শুধুমাত্র সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন। তারা জনগণকে এড়িয়ে সন্ত্রাসবাদী পথে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ফলে জনগণের সঙ্গে তারা সম্পর্কিত নন। তাই গ্রাম বা শহরে তাদের কোন ভিত্তি এলাকা গড়ে ওঠেনি। কৃষক শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু সংখ্যক যুবক ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনাতে তাদের সঙ্গে সংগঠনগতভাবে যুক্ত।

(৩) জাফর মেনন গ্রুপ। "কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি" জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ও জনগণতন্ত্রের শ্রেণী সংগ্রামকে পৃথক পৃথকভাবে কার্যকরী করার পক্ষপাতী। পাকিস্তানী শোষণ ও শাসন প্রসঙ্গে এরা বলেন—পূর্ব বাংলার জনগণের উপর বৃহৎ বিজাতীয় পুঁজির জাতিগত নিপীড়ন চলছে এবং ঘটনা চক্রে এই বৃহৎ বিজাতীয় পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছে। তারা বিপ্লবী—কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের বিরোধী। তাদের মতে বিপ্লবের মাধ্যমেই পরবর্তীকালে পার্টি গড়ে উঠবে। এঁরা কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কিত হবার চেষ্টা করেন এবং সিলেটে একটি ভিত্তি এলাকা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। টঙ্গি এলাকার শ্রমিকরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

(৪) মতিন-আলাউদ্দিন-দেবেন-বাসার গ্রুপ। "পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি" নামে এরা পরিচিত। পূর্ব বাংলার জনগণের বেশির ভাগ কৃষক এবং তারা যেহেতু সামন্তবাদী শোষণে জর্জরিত সেহেতু পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে সামন্তবাদী শোষণের দ্বন্দ্বই প্রধান। কিন্তু বর্তমানে

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ এমন উলঙ্গ রূপ নিয়েছে যে পূর্ব বাংলার জনগণ এখন পাকিস্তানী তথা পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদের বিদেশী শক্তি বলে মনে করছে এবং তাদের শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি কামনা করছে। ফলে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা একই সঙ্গে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত বলে মনে করেন এবং এ দুই সংগ্রামকে একই সঙ্গে সশস্ত্র গণযুদ্ধের রূপ দেবার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। কৃষক ফ্রন্টে মতিন-আলাউদ্দিন এবং শ্রমিক ফ্রন্টে দেবেন শিকদার ও বাসার রাজনীতি প্রচারের দায়িত্ব নেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় খুব কম সময়ের মধ্যেই পাবনা, বগুড়া, যশোর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল ও নোয়াখালিতে ভিত্তি অঞ্চল সমূহ (লাল এলাকা) গড়ে ওঠে। ঢাকার পোস্তগোলা শ্যামপুর-নরসিংদী জয়দেবপুর ও নারায়ণগঞ্জ, পাবনার ঈশ্বরদী, পাকশী ও সৈয়দপুর, কুমিল্লার আখাউড়া, লাকসাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ, নোয়াখালির ফেনী ও চট্টগ্রামের ষোল শহর, বালুর ঘাট, ফৌজদার হাট, চন্দ্রঘোনা, নাসিরাবাদ, বারবকুণ্ড, পতেঙ্গা, কাপ্তাই ইত্যাদি এলাকার বন্দর, রেল ও ডক শ্রমিকরা এই পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত। খুলনা ছাড়া পূর্ব বাংলার প্রতিটি জেলাতে এই পার্টির রাজনৈতিক কার্য-কলাপ জালের মত ছড়িয়ে আছে। এই পার্টি তাঁদের লাল এলাকাসমূহে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে ও দেশীয় শোষকদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাবার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলাতে থাকে। তাঁরা গেরিলা সেনা গড়ে তুলেন এবং সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা গড়ে তোলার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণকে আহ্বান জানান। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকায় উপরোক্ত প্রতিটি পার্টিই গোপনে তাদের কার্যকলাপ চালাতে থাকে এবং প্রকাশ্যভাবে মাওলানা ভাসানীর ন্যাপের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। এঁদের বাদ দিলে মাওলানা ভাসানীর ন্যাপে আর যারা আছেন তারা হচ্ছেন শ্রেণীগতভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয় ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী, মুক্তি সংগ্রামে যাদের প্রগতিশীল ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে "আইন ও শৃঙ্খলা" রক্ষার নাম করে ইয়াহিয়া লিগাল ফ্রেম অর্ডার নামে কতগুলি সর্তমূলক আইন

জারি করে, যে সর্তগুলো মেনে নিলে গণতন্ত্র বলতে অবশিষ্ট কিছুই থাকেনা। সর্তগুলোর অন্যতম পাঁচটি হলো (এক) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দেয়া পর্যন্ত সামরিক শাসন চালু থাকবে এবং ইয়াহিয়ার হাতে সর্বময় রাষ্ট্রীয় ও নির্বাচনী ক্ষমতা থাকবে : (দুই) নির্বাচিত পরিষদ তিনি (ইয়াহিয়া) ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা রাখেন এবং তার জন্য কোন কৈফিয়ত দিতে তিনি বাধ্য নন ; (তিন) নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সবাই একপক্ষে রায় দিলেও সেটা তার (ইয়াহিয়ার) মনোমত না হলে তাতে তিনি স্বাক্ষর দেবেন না এবং তার স্বাক্ষর ব্যতীত কোন আইন শাসনতন্ত্রে গৃহীত হবে না ; (চার) পাকিস্তানের সংহতির বিপক্ষে যে কোন প্রস্তাব আনা হলে পরিষদকে বাতিল করে দেওয়া হবে ; (পাঁচ) এই শাসনতন্ত্র ১২০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে না পারলে নির্বাচিত পরিষদকে বাতিল ঘোষণা করা হবে। বামপন্থী কমিউনিষ্ট দলগুলো গণতন্ত্রের নামে এ প্রহসনকে প্রতিহত করার আহ্বান জানান এবং ইয়াহিয়া সরকারকে সামরিক শাসন তুলে নেবার জন্য হুঁশিয়ার করে দেন। কিন্তু শেখ মুজিব সহ ডানপন্থী ক্ষমতালোভী তথাকথিত নেতৃবর্গ ক্ষমতা লাভের আশায় ইয়াহিয়ার লিগাল ফ্রেম অর্ডারের গণতন্ত্রের পরিপন্থী সর্তসমূহ মেনে নেন এবং ইয়াহিয়া সরকারকে শান্তিকামী ও গণতন্ত্রী বলে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা ইয়াহিয়া সরকারের সমালোচক বামপন্থী দলগুলোকে সমাজবিরোধী, গণদুশমন রূপে অভিহিত করেন এবং নিজদের গুণ্ডাবাহিনীকে তাদের উপর লেলিয়ে দেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার ইতিহাস নিজেই আজ প্রকাশ করেছে কারা সত্যিকার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছে আর কারাই বা সত্যিকার গণদুশমন ছিল।

১৯৭০ সালের পাঁচই অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। হঠাৎ ইয়াহিয়া সে নির্বাচন সাতই ডিসেম্বরে পরিবর্তিত করে তার যথেচ্ছাচারিতার আর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। গণমনে তীব্র বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও আপোষকামী ক্ষমতালোভী স্বার্থপর এ সকল ডানপন্থী নেতারা জনগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে এবং ইয়াহিয়ার এ সিদ্ধান্তকেও আপোষের পথে মেনে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারকার্য চালাতে থাকে। পূর্ব বাংলার দুঃখময় রাত্রি বারোই নবেম্বর প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে প্রায় তিরিশ লক্ষ লোক হতাহত ও সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। এমন দুঃসময়েও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা কেউ এই অসহায় নিরাশ্রয়

জনগণকে সাহায্য করা দূরে থাক একবার দেখবারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। মানবতার বিরোধী এই সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের ভেক ধ্বজাধারীদের মুখোশ খুলে পড়ে এবং বামপন্থী বিভিন্ন নেতা ও মাওলানা ভাসানী এদের তীব্র সমালোচনা করেন। এককালের পাকিস্তান সংহতির অন্যতম অগ্রনায়ক মাওলানা ভাসানী চব্বিশে নবেম্বর পল্টন ময়দানে ঘোষণা করেন—"তোমাদের এই ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি সব বোগাস"। তিনি চৌঠা ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের অপর এক জনসভায় ঘোষণা করেন—"আজ থেকে পূর্ব বাংলা স্বাধীন ও সার্বভৌম, আমাদের এ দেশকে আমরাই সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে গড়বো"। তিনি তার দলকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে দুস্থ মানবাত্মার সেবা করার নির্দেশ দেন।

এরই মধ্যে শেখ মুজিবসহ ক্ষমতালিপ্সু পূর্ব বাংলার ডানপন্থী নেতারা শবদেহের উপর দাঁড়িয়ে মানবতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে ভোট ভিক্ষায় লিপ্ত হয়। সাতই ডিসেম্বর এই তথাকথিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল), পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন, মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ ও ন্যাপে অবস্থান রত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি এবং আতাউর রহমানের জাতীয় প্রগতি লীগ অংশ গ্রহণে বিরত থাকে। নির্বাচনে সকল প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীরা, যথা আওয়ামী লীগ, তিনটি মুসলীম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল (পি ডি পি) অন্যান্য স্বতন্ত্র দল ও সংশোধনবাদী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির (বর্তমানে বাংলা দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মস্কো ন্যাপ অংশ গ্রহণ করে। পাকিস্তান নির্বাচনী কমিশনার পূর্ব বাংলার নিম্নরূপ নির্বাচনী রায় ঘোষণা করেন। বামপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বীহীন এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেয়েছে মোট ভোটের শতকরা তেত্রিশ ভাগ; অন্যান্য দল ১৭ ভাগ, জাল ভোট ও বাতিল ভোট ছয় ভাগ, মোট গৃহীত ভোট হল শতকরা ৫৬ ভাগ।

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬১টি আসনে (অর্থাৎ পূর্ব বাংলার ১৬৩টি আসনের মধ্যে ১৬১টি আসনে) জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদেও অনুরূপ বিজয় লাভে আওয়ামী লীগ [illegible] হয়। নির্বাচনের এই ফলাফল পাকিস্তানী শাসক ও শোষক [illegible] আতঙ্কিত করে তোলে। পশ্চিমা শোষক গোষ্ঠী ভেবেছিল

লীগ খুব বেশি হলে ১২০টি আসনে জয়ী হবে এবং বাকী ১৮০টি আসনের একটি ঐকাবদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দ্বারা আওয়ামী লীগকে সংখ্যালঘু পার্টি হিসাবে দমিয়ে রেখে পূর্ব বাংলার ধনিক সামন্ত গোষ্ঠী সহ সকল জনগণকে চিরাচরিত ঔপনিবেশিক প্রথায় শোষণ করা যাবে। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনাকে পূর্ব বাংলার জনগণ কার্যতঃ ব্যর্থ করে দিয়েছে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর দুই প্রতিনিধি ইয়াহিয়া ও ভুট্টো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে নূতন ষড়যন্ত্রের পথ খুঁজতে থাকে।

এদিকে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ও পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধীনতার দাবীতে প্রবল জনমত সৃষ্টি করে। কেননা নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের কর্মীরা "জয় বাংলা মানেই স্বাধীন বাংলা" বলে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিল। বাস্তবে স্বাধীনতা আনয়নের প্রতিশ্রুতিই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সাফল্য ঘটিয়ে ছিল। এক্ষণে আওয়ামী লীগের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ স্বাধীনতার দাবীতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। অপরদিকে পূর্ব বাংলার সেনা বাহিনী ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট ও আধা সামরিক বাহিনী ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই পি আর)-এর সেনারাও (যারা এতদিন পাঞ্জাবী সেনা কর্তৃক পদে পদে লাঞ্ছিত নির্যাতিত এবং অপদস্থ হয়েছে) স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে শেখ মুজিবকে চাপ দিতে থাকেন। এমন কি পূর্ব বাংলার সকল বাঙালী আমলা অফিসাররাও এই স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসেন। অন্যদিকে হক্-তোয়াহাদের পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) ছাড়া অন্য সব কটি বামপন্থী দল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের ব্যাপক প্রচার ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন।

ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন সামরিক শাসকরা ঢাকা, ঈশ্বরদী, সান্তাহার, পাকশী সিরাজগঞ্জ, সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শহরে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, যা কমিউনিষ্টরা কঠোর মনোভাব দ্বারা ব্যর্থ করে দেয়। উপায়ান্তর না পেয়ে ভুট্টোর পরামর্শ অনুযায়ী ১লা মার্চ ইয়াহিয়া সরকার ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের টেকনাফ থেকে দিনাজপুরের তিতুলিয়া সীমান্ত পর্যন্ত

প্রতিবাদের ঢেউ বয়ে যায়। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পিপাসু মারমুখি জনতার মিছিলে ছেয়ে যায় প্রতিটি শহর। শেখ মুজিবের নির্দেশে সমগ্র প্রদেশে প্রতিপালিত হয় হরতাল, বন্ধ হয়ে যায় অফিস আদালত, যানবাহন, ব্যাঙ্ক বীমা, স্কুল কলেজ ও কলকারখানাগুলো। পশ্চিমা শোষকগোষ্ঠী পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সজাগ জনতা সে ষড়যন্ত্রকেও ব্যর্থ করে দেয়। সমগ্র পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী জনতা স্বাধীনতা ও গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য বিক্ষোভ মিছিল করে এগিয়ে যায় ধানমণ্ডিতে অবস্থিত শেখ মুজিবরের বাড়ীর পানে। ২রা মার্চ বর্বর সেনারা তেজগাঁও ও মালিবাগ এলাকায় গুলি করে নাগরিক হত্যা করা সত্বেও ৩রা মার্চ শেখ মুজিব 'নিষ্ক্রিয় নিরস্ত্র পথে "অহিংস ও অসহযোগ" আন্দোলনের ডাক দেন এবং হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করে কালো পতাকা উত্তোলন করার নির্দেশ দেন।

এদিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণকে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে সামিল হয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে অত্যাচারী হানাদান সেনাদের খতম অভিযান চালাতে নির্দেশ দেন। পার্টির একটি গেরিলা দল ৫ই মার্চ রাত ১১টায় মহাখালী রেলগেটে পাঞ্জাবী সেনাদের একটি ঘাঁটি আক্রমণ করে একটি সশস্ত্র সেনাকে নিহত এবং অপর একজনকে আহত করে। ৬ই মার্চ এই পার্টি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র আদায় করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিকদের সমন্বয়ে একটি ঐক্যফ্রন্টের আহ্বান জানান এবং "পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফৌজ" গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা তাঁদের এই বক্তব্যের ব্যাপক প্রচার করেন এবং অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র লীগের নেতৃবর্গ ও কর্মীরা সশস্ত্র যুদ্ধের পথে স্বাধীনতা আদায়ের জন্য ঐক্য ফ্রন্টের প্রশ্নে একমত হন।

ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া সরকার এক আপোষ আলোচনার জন্য শেখ মুজিব ও ভুট্টোকে এক গোল টেবিল বৈঠকে আহ্বান করেন। শেখ মুজিব ৭ই মার্চ নিম্নোক্ত চারটি দাবী না মানা পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। দাবী চারটি হলো—(১) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নিতে হবে। (২) সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে

হবে ; (৩) অবিলম্বে গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং (৪) ২রা মার্চ তেজগাঁয়ে হত্যাকারী সেনাকে তদন্ত করে বের করে উপযুক্ত শাস্তি বিধান ও নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সেদিনই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী ছাত্রবৃন্দ রেসকোর্স ময়দানে "স্বাধীন বাংলা দেশের" পতাকা উত্তোলন করেন এবং জনগণকেও স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দেন। ৯ই মার্চ মাওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানের এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের অহিংস নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তুলে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন। তিনি "স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার" স্বীকৃতিও দাবী করেন। সেদিন রাতে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির অপর এক গেরিলাদল ঢাকা কেন্টনমেন্টে অবস্থিত এক পাঞ্জাবী কর্ণেলের বাড়ী আক্রমণ করেন এবং ঐ কর্ণেলকে হত্যা করে তার ষ্টেনগান নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এর পর থেকে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি, কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি, পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন এবং ভাসানী ন্যাপ যুক্তফ্রন্ট ও গণমুক্তি ফৌজের মাধ্যমে সশস্ত্র যুদ্ধের ব্যাপক প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপোষকামী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ অহিংস ও অসহযোগ নীতির ভিত্তিতে সশস্ত্র যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে। ফলে আওয়ামী লীগের ছাত্রপ্রতিষ্ঠান ছাত্র লীগের মধ্যে মতবিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাকামী ছাত্র লীগের "রব গ্রুপ" ঐক্যবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের পথে দেশকে স্বাধীন ও জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করে একটি ভালো সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন।

দেশের জনগণ যখন স্বদেশকে রাহুমুক্ত করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করে চলছেন ঠিক তেমনি সময় পাক সেনারা রাজারবাগ পুলিশ ষ্টেশনের অস্ত্রাগার, ই পি আর সদর দপ্তর ও তার অস্ত্রাগার দখল করার এবং পুলিশ ও ই পি আরকে নিরস্ত্র করার এক প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। জয়দেবপুরে অবস্থিত পূর্ব বাংলার একমাত্র অস্ত্র কারখানাটি পাকিস্তানী সেনারা দখল করতে গেলে, পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট কর্মী, ই. পি. আই ডি. সি শ্রমিক ফেডারেশনের সেক্রেটারী আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে পরিচালিত স্থানীয় শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য ছাত্র জনতা কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত

হয়। উভয় পক্ষের মাঝে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে। এমনি সময় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙ্গালী সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে সশস্ত্র ভাবে বেরিয়ে এসে শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং প্রচণ্ড গোলাগুলির পর পাকিস্তানী সেনাদের হটিয়ে দিয়ে অস্ত্র কারখানাটি নিজেরা দখল করে নেয়।

এদিকে শেখ মুজিবের উল্লেখিত চার দফা দাবী নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য দুরাত্মা জল্লাদ ইয়াহিয়া ভালো মানুষের ছদ্মবেশে ঢাকা আগমন করে। সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আপোষকামী ক্ষমতা-লিপ্সু নেতারা এই নরপিশাচের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপোষ আলোচনায় লিপ্ত হন। পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে জনগণ ও পূর্ব বাংলার ছাত্র সম্প্রদায় (এমনকি ছাত্র লীগের রব গ্রুপ যা ছাত্রদের মাঝে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছিল) এই আপোষ আলোচনার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রায় "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম," "এবারের রক্ত স্বাধীনতার রক্ত"; "রক্ত দিয়েছি আরো দেবো বাংলা দেশ স্বাধীন করো"; "খুনির সাথে আপোষ আলোচনা চলবে না চলবে না" ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে এবং শেখ মুজিবের বাড়ীতে আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দুরাত্মা ইয়াহিয়া আলোচনার নামে সময় নিয়ে নরখাদক রক্তপিপাসু টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসক হিসাবে ও পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ষাট হাজার সেনাকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠায়। এই সেনাবাহিনীর পূর্ব বাংলা অভিমুখে অগ্রসরের সংবাদ বি বি সি থেকে প্রচার করা হয়। নরপিশাচ ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীকে অবতরণের সময় ও সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে থাকে এবং অবশেষে পশ্চিমা জল্লাদ ভুট্টোকে ডেকে পাঠায়। ইসলামবাদে অনুষ্ঠিতব্য গোলটেবিল বৈঠক অবশেষে অঘোষিত ভাবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ "ইয়াহিয়া হুঁসিয়ার" "ভুট্টোর মুখে জুতা মার, বাংলা দেশ স্বাধীন কর" ইত্যাদি শ্লোগান সহকারে বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা চালাতে থাকেন। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো আলোচনার নাম করে সময় নিতে থাকে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তাদের ধ্বংসলীলার পরিকল্পনার কথা জানতে দেয়নি। সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছলে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট

পার্টির নির্দেশে শ্রমিক নেতা আবুল বাসারের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিকরা সেনাবাহিনীর অস্ত্রসমূহ জাহাজ থেকে নামাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পশ্চিমা সেনারা শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়ে তাদের কাজে যোগ দেবার নির্দেশ দেয়, কিন্তু বিপ্লবী শ্রমিকরা সে নির্দেশ উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

২৩শে মার্চ ঢাকায় সংগ্রামী ছাত্ররা আপোষকামী আওয়ামী লীগের অনুমোদন ছাড়াই পাকিস্তানের জাতীয় পতাকায় অগ্নিসংযোগ করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং জনগণকেও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার আহ্বান জানান। সারা পূর্ব বাংলার জনগণ ঐদিন পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলার এক পতাকা উড়িয়ে তাদের স্বাধীনতার আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ভুট্টো চক্র পূর্ব বাংলার প্রতিটি জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা ও মুক্তিকামী প্রতিটি বাঙ্গালীকে হত্যা করার এক নৃশংস ও পৈশাচিক নির্দেশ দিয়ে রাতের আঁধারে পূর্ব বাংলা থেকে পালিয়ে যায়। পূর্ব বাংলার ইতিহাসে দুঃস্বপ্নের মত নেমে আসে দুঃখময় রাত্রি ২৫শে মার্চ। পৃথিবীর ইতিহাসে হিটলার, মুসলিনীর ও ভিয়েতনামে মার্কিণ বর্বরতাকে ম্লান করে দিয়ে টিক্কা খাঁন সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলার শহর থেকে গ্রামগুলি পর্যন্ত ধূলিসাৎ করে দিতে থাকে। পূর্ব বাংলার বুকে অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী সেনারা নিরস্ত্র জনগণের উপর অমানুষিক বর্বরতার সঙ্গে চালিয়ে যায় ট্যাঙ্ক, কামান, মেশিনগান, ষ্টেনগান, ব্রেণগান ও বোমা। এক অঘোষিত যুদ্ধের মাধ্যমে তারা নির্বিচারে গণহত্যা চালাতে থাকে এবং দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়ে তারা একটানা চল্লিশ ঘণ্টা সান্ধ্য আইন জারী করে এবং এ সময়ে শুধু ঢাকাতেই তারা কমপক্ষে চব্বিশ হাজার নিরস্ত্র নাগরিককে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করে। সঙ্গে সঙ্গে তারা চালায় লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং ধ্বংসলীলা ও নারী ধর্ষণের মত ঘৃণ্য পাশবিক কার্যসমূহ।

পূর্ব বাংলার এই নির্যাতীত মার খাওয়া জনগণ বিনা প্রতিবাদে আর মার খেতে রাজী হলো না। গুলি খাওয়া বাঘের ন্যায় পূর্ব বাংলার বীর জনতা বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করে জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। পূর্ব বাংলার

কৃষক শ্রমিক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা সশস্ত্র শত্রুকে সশস্ত্র ভাবেই মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতৃত্বে সমবেত হতে থাকেন। তাঁরা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে সশস্ত্র ভাবেই আক্রমণ করেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল পাক সেনাবাহিনীকে খতম করতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হন। চট্টগ্রামে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রমিক ফ্রন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল বাসারের নেতৃত্বে বর্তমানে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সর্ব প্রথম চট্টগ্রাম বেতার থেকেই ২৬শে মার্চ রাতে ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রামের ক্যান্টনমেণ্টে যখন পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙ্গালী সৈন্যদের নিধন যজ্ঞ চালায় তখন কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী অফিসার ও সৈনিক পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা কমরেড নিজামুদ্দিনের নেতৃত্বে সমবেত হয়ে ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করে এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঐ দিনই চট্টগ্রাম থেকে ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির সহযোগিতায় মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ২৮শে মার্চ পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানানো হয়। মেজর জিয়ার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট আজো পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতার বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। পাবনাতে টিপু বিশ্বাসের পরিচালনায় পূর্ব বাংলায় কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড আব্দুল মতিন ও কমরেড আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গেরিলারা সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। টাঙ্গাইল টঙ্গি ও ময়মনসিংহে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি, কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি, ভাসানী ন্যাপ ও কৃষক সমিতি ঐক্যবদ্ধ ভাবে মোহনের গেরিলা নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। রংপুর ও বগুড়াতে তপন চৌধুরীর ছমির মণ্ডলের নেতৃত্বে (পাক সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শহীদ হয়েছেন) পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি যুদ্ধ করছেন। এই পার্টি সিলেট ও কুমিল্লায় সমন্বয় কমিটির সঙ্গে এবং বরিশাল ফরিদপুরে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ করে চলেছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন যথাক্রমে কাজী জাফর ও কলিমুল্লাহ এবং মতিউর রহমান ও বাদশা। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার

ভেঙ্গে কমরেড দেবেন শিকদার (পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক) সম্প্রতি বেরিয়ে আসেন এবং আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আগরতলার যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কর্মীদেরকে সংগঠিত করতে থাকেন। এই বামপন্থী দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য স্থানেও ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছেন ও সংগঠিত হচ্ছেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এই যুদ্ধরত বীর যোদ্ধাদের নাম ও কার্যাবলী কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করছেন না, এবং এর পিছনে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাই দায়ী।

আওয়ামী লীগ, দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত মস্কোপন্থী ন্যাপ (সংশোধনবাদের জন্য যারা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে) কোন দিনই পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা চালায় নি এবং সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতিকে সঠিক বলে স্বীকার করে নি। "বন্দুকের নল থেকেই সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে"—এই মহান তত্বকে তারা তাদের শ্রেণীগত চরিত্রের জন্যই গ্রহণ করতে পারে নি। ফলে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠা সত্বেও আওয়ামী লীগ নেতারা নিজ দেশের রণক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের অসংগঠিত অবস্থায় রেখেই প্রাণভয়ে ইন্দিরা সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে স্বভাবতই মুক্তিযোদ্ধারা যোগাযোগ খাদ্য সরবরাহ, সুসংগঠন, প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ ও সর্বোপরি নেতৃত্বের অভাব উপলব্ধি করেন ও তাদের মনোবল হারাতে থাকেন।

"জনৈক মুক্তিযোদ্ধা"র নামে নিম্নোক্ত লেখা "দর্পণে" প্রকাশিত।

পূর্ব বাংলার যুদ্ধরত বন্ধুরা, আপনাদের জানাই অসংখ্য শ্রদ্ধা, জানাই লাল সালাম! আপনারা যুদ্ধ করছেন, দেশের ভিতরের ও বাইরের শোষক শ্রেণী, তাদের দালাল শ্রেণী এবং তাদের রক্ষী বাহিনী খতম করে দেশকে শোষণ ও নিপীড়ন মুক্ত করার জন্য। কমরেড লিন পিয়াও বলেছেন, "বিশ্বের যেখানেই যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁরা আমাদের সঙ্গে আছেন, তাঁদের এ সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামেরই এক ধাপ।" অতএব আপনারা এ যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে পরিণত করুন, কারণ আপনারা নিশ্চয়ই নিপীড়িত লাঞ্ছিত ও শোষিত বাংলার জনগণকে শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত করতে যাচ্ছেন। এ জনগণের প্রতি আস্থা রাখুন, তাদের উপর নির্ভর করে দৃঢ় পদে এগিয়ে যান, জয় আমাদের হবেই। এ প্রসঙ্গে যোদ্ধা হিসাবে আমরা সর্বদা

মনে রাখবো কমরেড মাও-এর বাণী, "জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম কোন মতেই প্রতিক্রিয়াশীল বা তাদের পদলেহী দালাল শ্রেণীর উপর ন্যস্ত করা উচিত হবে না, কেবলমাত্র জনগণকে সুসংগঠিত করেই এ সমস্যার সমাধান করা যায়।"

বন্ধুরা! প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী শাসকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। পূর্ব বাংলার এ মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে পিকিং রেডিও ৬ই এপ্রিল পাকিস্তানী প্রচারের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, "পূর্ব বাংলার মুক্তি যোদ্ধাদের দমনের জন্য চীন পাকিস্তানকে বর্তমানে সাহায্য দিচ্ছে ইহা কুৎসা মাত্র।" গণ-চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির একজন কমরেড পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। আওয়ামী লীগ প্রসঙ্গে সে ভদ্রলোক বলেন, "বস্তুতঃ আওয়ামী লীগ হলো পূর্ব বাংলার বড় ধনিক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা সম্পূর্ণরূপে কমিউনিষ্ট বিরোধী এবং চীন বিরোধী ভূমিকা পালন করে আসছে এবং যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তার অনুগামী সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত, ফলে শুধু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত চীন বিরোধী কোন সরকারকে নীতিগত ভাবেই চীন সমর্থন করতে পারে না।" পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"It has been a national oppression and suppression throughout the long 23 years. Now it has taken a naked shape. If you can form a united front against aggression—then and only then we can support this movement."

পূর্ব বাংলার বর্তমান সংগ্রাম প্রসঙ্গে জুলাই মাসের Peking Review তার সরকারী বক্তব্যে লিখেছেন, "We support Pakistan Govt *against foreign aggression*...In certain isolated pockets of East Pakistan, Local Marxist-Leninists are taking over the fight and meeting the Pakistani troops in armed combats. They have been able to "hold out" in some of these areas, although previously these forces did not enjoy much popular suport" অক্টোবরের Peking Review সরকারী ভাবে স্বীকার করেছেন যে—*Revolution is going in* Pakistan.

সুতরাং চীন ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র গণযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা তো করবেই না বরং তাকে সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতিও উপরোক্ত কথায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শোষক গোষ্ঠীর কোন দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গড়ে তুলি ও সশস্ত্র গণযুদ্ধের মাধ্যমে পিতৃভূমি থেকে শোষক ও অত্যাচারীদের সমূলে উৎখাত করি। আজ আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ, দলীয় স্বার্থকে ভুলে গিয়ে জাতীয় মুক্তি জনগণের গণতন্ত্রের স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরি এবং পূর্ব বাংলাকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী জনগণের গণতান্ত্রিক স্বরাষ্ট্রে পরিণত করি।

সর্বশেষে আমি পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের একজন হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম-এল)-এর প্রতিটি বিপ্লবী কর্মীর প্রতি আকুল আবেদন জানাই, দয়া করে আপনারা পাকিস্তান ভিত্তিক বিপ্লবের পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। যদিও মার্কসবাদীরা সমগ্র বিশ্বের জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে, তথাপি বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে জনগণের চেতনার স্তর ও পরিচালনা করার মত গড়ে ওঠা একটি বিপ্লবী পার্টি ইত্যাদি বিপ্লবী পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ড বিভিন্ন হতে বাধ্য। আসুন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র লড়াই করে নিজেদের বিপ্লবী বলে কার্যতঃ প্রমাণ করি, কারণ শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে না, সে বিপ্লবী হতে পারে না। আসুন এ সংগ্রামকে আমরা জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামের রূপ দেই। "পূর্ব বাংলায় ফ্যাসিষ্ট অভ্যুত্থান দমন করা হচ্ছে"—এ বক্তব্য দিয়ে আপনারা নিষ্ক্রিয়তা অতি-গোপনীয়তা এবং অপর যুদ্ধরত বিপ্লবীদের সঙ্গে অসহযোগিতার নীতিতে সঙ্কীর্ণতাবাদকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন।

আমি জানতে চাই পূর্ব বাংলার প্রায় সাড়ে সাত কোটি জনতা কী ফ্যাসিষ্ট ছিলেন? পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার, নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস, পূর্ব বাংলার মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার কি ফ্যাসিষ্ট কার্যকলাপ নয়? তবে আপনারা এ ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারীদের সম্পর্কে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থেকে পরোক্ষ ভাবে সমর্থন দিচ্ছেন কোন বিপ্লব সফল করার উদ্দেশ্যে?

আপনারা যে ফ্যাসিষ্টদের কথা বলছেন বাস্তবে সে ফ্যাসিষ্টরা সীমান্তের ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করছে। নির্বিচারে গণহত্যার প্রতিবাদে জনগণ আজ অস্ত্র ধারণ করেছেন, যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংগ্রামী জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাদের সঙ্গে, তাদের পথে নেমে আসুন! আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে মহান নেতার সতর্কবাণী "নিষ্ক্রিয়তাবাদ সন্দেহবাদ ও সঙ্কীর্ণতাবাদ হচ্ছে সংশোধনবাদ।" আপনারা এই সংশোধনবাদী ভুমিকা ত্যাগ করে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে (যারা বর্তমানে পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণের "শ্রেণীশত্রু") খতম করে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন। মহান লেনিনের অমর বাণী "যে শোষিত ও নিপীড়িত জাতি শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করে না এবং অস্ত্রের পরিচালনা শিক্ষা করে না শোষণ ও নিপীড়নই সে জাতির একমাত্র প্রাপ্য"-কে নিজেদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করুন। প্রমাণ করুন মহামনীষী মার্কসের কথা "শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তির যে কোন আপোষহীন সংগ্রামই শ্রেণী সংগ্রাম।"

একথা সত্যি যে প্রতিক্রিয়াশীলরা কোন দিন মুক্তির সংগ্রাম চালাতে পারে না। কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক শ্রেণীর এ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব অবশ্যই বিপ্লবীদের দিতে হবে। সত্যিকারের বিপ্লবী হিসাবে এ সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করুন, কৃষক শ্রমিক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত এ ঐক্যবদ্ধ পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের বিপ্লবী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন। পূর্ব বাংলার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এর থেকে বিচ্যুত হলে আগামী দিনের ইতিহাস আপনাদের এ বাস্তব বর্জনতাকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করবে না। পরিশেষে আমি পুনঃ ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আহ্বান জানাই, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে পূর্ব বাংলার এ গণযুদ্ধে জনগণের বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করি, মুক্তির লাল সূর্যোদয় ঘটাই পূর্ব বাংলার পুব আকাশে।

পূর্ব বাংলার বামপন্থী রাজনীতি ঃ ভাসানী-তোহা সম্পর্কের ইতিকথা

সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান ঘৃণা বিদ্বেষ সন্দেহ ও অবিশ্বাস ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর এক আত্মঘাতী অস্ত্র প্রতিযোগিতার রূপ নেয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী পাকিস্তান সরকার "সিয়াটো" "সেন্টো" সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটভুক্ত হওয়া সত্বেও তাদের স্বীয় স্বার্থের কারণে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে তারা অসম্মতি জানায়। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান চীনের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গণচীনের সঙ্গে রাষ্ট্রগত সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। আইয়ুব সরকারের এই চীন ঘেঁষা নীতিকে ভাসানী ন্যাপে অবস্থান রত চীনপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মোহাম্মদ তোহা, আব্দুল হক, বদরুদ্দিন উমর, আসহারউদ্দিন, নজরুল ইসলাম ও ইন্দু সাহা প্রমুখ নেতৃবর্গ প্রগতিশীল আখ্যা দেন এবং প্রতিকর্মে এ সরকারকে তাঁরা সমর্থন জানাতে থাকেন। যে সরকার দীর্ঘ নয় বছর যাবৎ (তখনকার সময়ানুযায়ী) সামরিক শাসনের নামে জনগণের ওপর চালিয়েছে শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার আর নিষ্পেষণ; কেড়ে নিয়েছে জনগণের মৌলিক অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা বাক্যের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতাদর্শের স্বাধীনতা ; জনগণের প্রতিটি দাবীকে যে সরকার বুলেট, বেয়নেট ও লাঠি দিয়ে দমিয়ে রেখেছে, শতশত রাজবন্দীদের জেলে পুরে অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে সে সরকারকে আর যাই হোক প্রগতিশীল বলা যায় কি ? প্রতিটি শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে; অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে; সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানী ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামের অগ্রনায়ক। ক্ষমতার লোভে নয়, পদের মোহে নয় অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে মেহনতি জনগণের পার্শ্বে সর্বদাই মাওলানা ভাসানীর এক বিরাট সংগ্রামী নেতৃত্ব ছিল। অত্যাচারী স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার যতই চীন ঘেঁষা নীতি অবলম্বন করুক না কেন মাওলানা ভাসানী তাকে প্রগতিবাদী বলে স্বীকার করা দূরে থাক, বরং আইয়ুবশাহীর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে সংগ্রামের পথে আন্দোলনের পথে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। ফলে ন্যাপে অবস্থানরত

কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মাওলানা ভাসানীর নীতিগত বিরোধের সূত্রপাত হয়। আইয়ুব সরকারের মত প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে সমর্থন করার ফলে খোদ কমিউনিষ্ট পার্টিতে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। পার্টির অন্যান্য কমিউনিষ্ট নেতা পাবনার মতিন, আলাউদ্দিন এবং চট্টগ্রামের দেবেন শিকদার, আবুল বাসার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আইয়ুব সমর্থন ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন এবং মাওলানা ভাসানীর সংগ্রামকে সমর্থন জানান এবং তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির মোহাম্মদ তোহা সাহেবরা মাওলানা ভাসানী ও অন্যান্য সংগ্রামী কমিউনিষ্টদের এ ভূমিকাকে মহান চীন বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ বলে অভিহিত করেন এবং ঐ সকল কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেন। তাঁরা ন্যাপে থেকেও ন্যাপপ্রধান মাওলানা ভাসানীর এ সংগ্রামী কার্যকলাপকে নিন্দা করেন এবং ঐসকল সংগ্রামে অংশ গ্রহণে বিরত থাকেন। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ যখন ইয়াহিয়া পাকিস্তানে দ্বিতীয় বারের মত সামরিক শাসন জারী করে, তখন একমাত্র পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি তার জন্মলগ্নেই এই সামরিক শাসনকে উৎখাত করার জন্য চট্টগ্রামে এক প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলেন। এই সংগ্রাম ৬ই জুন সশস্ত্র গণ প্রতিরোধের রূপ নিয়েছিল। এই সংগ্রামের ফলে চট্টগ্রামের বীর শ্রমিকদের ৪৯ জনের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী হয়, ১৫০ জন সশ্রম সাজা ও বেত্রদণ্ড ভোগ করেন, এগার শত শ্রমিককে চট্টগ্রাম কেন্টনমেন্টে দৈহিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়, ৫ হাজার শ্রমিক তাদের চাকুরী হারায়, ৩৬ হাজার বাড়ীতে খানাতল্লাসী হয়। শ্রমিক শ্রেণীর এমনিতর নির্যাতনকে তৎকালীন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ তোহা নিন্দা তো করেনই নি বরং সামরিক সরকারকেই তিনি সমর্থন করেছিলেন।

মাওলানা ভাসানী এবং পার্টি থেকে বহিষ্কৃত সংগ্রামী কমিউনিষ্ট কর্মীরা (যারা পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেন) ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে পাবনার শাহপুরে দুদিন ব্যাপী এক বিরাট কৃষক সম্মেলনের আহ্বান করেন। কৃষক সমিতির সম্পাদক আব্দুল হক এ সম্মেলনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করেন এবং নানা অজুহাতে সম্মেলনের সাংগঠনিক কার্য থেকে দূরে সরে থাকেন। সম্মেলনের প্রথম দিনেই মাওলানা ভাসানীর সমর্থক এবং মোঃ তোহা সাহেবের সমর্থকদের পরস্পর বিরোধী শ্লোগান ও পাল্টা শ্লোগানের পরিণতি হিসাবে উভয় পক্ষের

মধ্যে হাতাহাতি সুরু হয় এবং দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনের প্রথম দিনেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনার পর মাওলানা ভাসানী এবং মোহাম্মদ তোহার সম্পর্ক আরো তিক্ততা লাভ করে। উভয় পক্ষ প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে থাকেন।

এ সময়ে প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি প্রবল আকার ধারণ করে। ঘুষখোর অফিসার, সুদখোর মহাজন, মুনাফাকারী মজুরদারী ও চোরাকারবারীদের অত্যাচার জনজীবনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। মাওলানা ভাসানী ঐ সকল দুর্নীতিবাজদের সতর্ক করে দেন এবং ১৯৭০ সালের জুন মাসে তাদের বিরুদ্ধে ঘেরাও অভিযান শুরু করেন। পূর্ব বাংলার ইতিহাসে ইহা জুন আন্দোলন নামে খ্যাত। এ ঘেরাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে মোহাম্মদ তোহা বিরূপ সমালোচনা করেন এবং তাতে অংশ গ্রহণে বিরত থাকেন। অন্যদিকে মাওলানা ভাসানীও তাঁদেরকে দুর্নীতিবাজদের সমর্থক হিসাবে অভিযুক্ত করেন ফলে তাঁদের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৮ সাল থেকেই আইয়ুব সরকারের স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবার জন্য মুক্তি কর্মী সংগ্রামী জনতা সভা ও শোভাযাত্রা চালাতে থাকেন। এসকল সভা ও শোভাযাত্রায় পুলিশ ও মিলিটারীর গুলি চালনার প্রতিবাদে সারা পূর্ব বাংলা ব্যাপী জনগণের যে সংগ্রামী চেতনা বৃদ্ধি পায় তার প্রকাশ ঘটে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে। ছয় দফার প্রণেতা শেখ মুজিবকে আইয়ুব সরকার বহু পূর্বেই "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" আসামী করে সামরিক কারাগারে বিচার চালাতে থাকে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের এ সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানী সংগ্রামের পথে নেমে আসার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। তাঁর এ আহ্বানে পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসেন। সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক এগারো দফা দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্টুডেন্টস অ্যাকশান কমিটি গঠন করে এবং স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারকে উৎখাত করার এক বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জনতা হরতাল, শোভাযাত্রা এবং জনসভা করতে থাকেন। এই জনসভায় পুলিশ ও মিলিটারী গুলি চালালে জনতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রাম ও শহরে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পুলিশ মিলিটারী, সুদখোর, মহাজন, ঘুষখোর অফিসার, চেয়ারম্যান, মেম্বার, এম. এন. এ ও দালাল গরুচোর, বদমাইশদের খতম করতে থাকে।

ঠিক এমনি সময় কোন সুসংগঠিত জনগণের রাজনৈতিক পার্টি (কমিউনিষ্ট পার্টি) এগিয়ে এসে যদি এ অসংগঠিত বিপ্লবী জনগণকে সংগঠিত করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পরিচালনা করার মহান দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিতেন তাহলে পূর্ব বাংলার ইতিহাস নিঃসন্দেহে অন্য ভাবে লিখতে হতো। মোহাম্মদ তোহার বিপ্লবী (!) পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালনা করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ঠিক এমনি সময়ে জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালনা করার মহান দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভাসানী ন্যাপের অন্যান্য বিপ্লবী কমিউনিষ্টরা মতিন আলাউদ্দিন দেবেন শিকদার ও আবুল বাসারের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গড়ে তোলেন পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি। নবগঠিত এ পার্টি জনগণকে পরিচালনা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ২০শে জানুয়ারী পুলিশের গুলিতে শহীদ হলেন কমরেড আসাদুজ্জমান, শহীদ হলেন রুস্তম, মতিউর, কমরেড হাসানুজ্জামান জানু মিয়া, আরো নাম না জানা অনেকে। মাওলানা ভাসানী ক্ষিপ্ত জনতাকে যে কোন মূল্যে এ সরকারকে প্রতিহত করার আদেশ দেন। বিপ্লবী বীর জনগণ সেদিন সশস্ত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তাঁরা আক্রমণ করেছিলেন ক্যান্টনমেন্ট। সরকারী দালালদের প্রচার কেন্দ্র, দালাল মন্ত্রীদের বাড়ী, সরকারী অফিস, আদালত, পুলিশ, মিলিটারীর গাড়ী, শহর গ্রামের থানায় থানায় এ বিপ্লবী জনতা সেদিন করেছিলেন অগ্নি সংযোগ, শোষণ নিপীড়ন থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত জনতা সেদিন সর্বাত্মক বিপ্লবী প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। অবশেষে আতঙ্কগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীল আইয়ুব সরকার জনগণের শক্তির নিকট আত্ম-সমর্পণ করে এবং শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নবগঠিত পূর্ব-বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি তখনো জনগণকে নেতৃত্ব দেবার মত সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পারে নি, তাদের এ দুর্বলতার কারণে জনগণের বিপ্লবী নেতৃত্ব শেখ মুজিবের হাতে চলে যায়। কিন্তু শেখ মুজিব তার শ্রেণীগত চরিত্রের জন্যই জনগণের বিপ্লবী চেতনায় আতঙ্কগ্রস্ত হন এবং তাদেরকে ভুলপথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে আপোষ আলোচনায় লিপ্ত হন। ফলে জন-গণের বিপ্লবী ভূমিকা ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় এবং অবিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণের ফলে সংগ্রামী জনগণকে বিপ্লবী গণযুদ্ধের পথে নিয়ে যাবার একটা সুবর্ণ সুযোগ পূর্ব পাকিস্তান

কমিউনিষ্ট পার্টির মোহাম্মদ তোহা সাহেবরা নস্যাৎ করেছেন।

মাওলানা ভাসানী অতঃপর সন্তোষে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কৃষক সম্মেলনে সি আই এর একটি দলিল সম্পর্কে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন। সে দলিলে ভারত পাকিস্তান সরকারের মাঝে কনফেডারেশনের চুক্তিতে দুই বাংলা ও আসামকে নিয়ে নূতন "বেংসাম" রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে মহান চীনের বিরুদ্ধে একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের কথা লিপিবদ্ধ ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। দলিলটি তিনি মোহাম্মদ তোহাকে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেন। মোহাম্মদ তোহা উক্ত দলিলকে তথাকথিত দলিল বলে উল্লেখ করেন এবং তা প্রকাশে বিরত থাকেন। পরে তিনি তার নিকট এ দলিলের উপস্থিতি অস্বীকার করেন। এতে উভয়ের মাঝে পরস্পর বিরোধী অভিযোগের বিনিময় হতে থাকে এবং জনগণের মনে মোহাম্মদ তোহার কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। মাওলানা ভাসানী এবং মোহাম্মদ তোহার মাঝে এভাবে যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তার থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই মোহাম্মদ তোহা তার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে গড়া ন্যাপ কৃষক সমিতি এবং শ্রমিক ফেডারেশনকে বিপ্লবের পরিপন্থী পাঁতি বুর্জোয়া সংগঠন হিসাবে এবং মাওলানা ভাসানীকে বিপ্লব বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে অভিযুক্ত করে ঐ সকল প্রতিবিপ্লবী গণসংগঠন থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

কিন্তু মোহাম্মদ তোহা সম্পর্কে গণমনে এক তীব্র-জিজ্ঞাসা বিরাজ করতে থাকে। কৃষি বিপ্লবের এতবড় একজন বিপ্লবী নেতা (নোয়াখালীতে যাদের পরিবারের তিরিশ হাজার বিঘা জমি আছে) সুদীর্ঘ আট বছর যাবৎ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি, ন্যাপের সম্পাদক এবং কৃষক সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেও সেখানে কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন না কেন? এমন সব প্রতিবিপ্লবী কৃষক শ্রমিক সংগঠন-গুলিতে দীর্ঘ দিন তিনি কেন ছিলেন এবং সেখানে তাঁর মত বিরাট বিপ্লবীর কি ভূমিকা ছিল? সকল শ্রমিক কৃষক সংগঠন যে প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব বিরোধী সংগঠন তা উপলব্ধি করতে মোঃ তোহার মত বিপ্লবীর এত দীর্ঘ সময় লাগলো কেন? তিনি কি কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এসব বলছেন? নাকি তোহা সাহেব নিজেই প্রতিবিপ্লবী ইত্যাদি জিজ্ঞাসার ধুম্রজালে জনগণকে ফেলে রেখে মহান বিপ্লবী নেতা তাঁর বিপ্লবী দলবল নিয়ে সকল বিপ্লব বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সংস্পর্শকে চরম ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেন।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ শাসন অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনতা বর্তমানে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত। অত্যাচারী অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার শোষিত লাঞ্ছিত জনগণ আজ হাতে তুলে নিয়েছে রাইফেল, চালিয়ে যাচ্ছে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তি-যোদ্ধারা তাদের পিতৃভূমিকে শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তির দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ঐক্যবদ্ধ, অদম্য মনোবলে বলীয়ান। এতদসত্ত্বেও প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অসাফল্য ও বিপর্যয়ের মূলে সুনির্দিষ্ট কতগুলো কারণ সম্পর্কে আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন।

মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই হলো পূর্ব বাংলার যুব ছাত্র সম্প্রদায়। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, বিদ্রোহী বাঙ্গালী পুলিশ, মিলিটারী, ই পি আর এবং আনসার বাহিনী। রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পূর্ব বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা প্রধানতঃ দুটি শিবিরে বিভক্ত। রণনীতি ও রণকৌশলগতভাবেও এরা সম্পূর্ণ পৃথক ও পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করে থাকে। এদের প্রথমটি হচ্ছে শেখ মুজিবের অনুগামী আওয়ামী লীগের সমর্থক—যারা নীতিগত ভাবে শুধুমাত্র পাকিস্তানী শাসন থেকে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের কথা বলছে। এরা মুক্তি ফৌজ নামে প্রকাশ্য সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে এবং প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। এদের পরিচালনা করছে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যারা ইতিমধ্যেই ভারতের বুকে স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন করেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা শ্রেণীগত চরিত্রের কারণেই অতি সতর্কতার সঙ্গে জনগণকে সশস্ত্র হতে না দিয়ে সর্বদা অহিংস ও অসহযোগের মাধ্যমে দাবী আদায়ের আপোষের রাজনীতি করে আসছে। সস্তা উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধূয়া তুলে জনগণ থেকে তাঁরা ভোট আদায় করেছে কিন্তু জনগণকে রাজনীতিগতভাবে সচেতন বা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ও সশস্ত্র করে তোলার কোন প্রচেষ্টা করেনি, বরং অহিংস নীতিতে সর্বদাই সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। কারণ শ্রেণীগতভাবে আওয়ামী লীগ হচ্ছে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। শ্রেণীগত চরিত্রের জন্যই জনগণকে সশস্ত্র করতে তারা ভয় পেতো এবং অহিংস

আন্দোলন ও আপোষ আলোচনার পথে দাবী আদায়কে কৌশলগত ভাবে অবলম্বন করেছিলো মাত্র। এবং পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি পূর্ব বাংলার শতকরা আশি ভাগ কৃষক ও আট ভাগ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা বা তাদেরকে রাজনীতিগতভাবে সচেতন করে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা ইত্যাদি মূল কর্তব্যকে উপেক্ষা করে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় ধনিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সমবেত করে, পাকিস্তান সহ বিশ্বের ধনিক শ্রেণীর স্বার্থকে বজায় রেখে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচীই ছিল আওয়ামী লীগের মূল রাজনীতি।

তাদের এ আপোষের রাজনীতিকে ব্যর্থ করে দিয়ে নরপিশাচ ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী যখন পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনগণকে রাইফেল ষ্টেনগান মেশিনগান কামান ট্যাঙ্ক ও বোমাদ্বারা আক্রমণ করে গণহত্যা অভিযান চালালো তখন দেখা গেল নেতৃত্ব দেবার মত একজন আওয়ামী লীগ নেতাও জনগণের পার্শ্বে নেই, কারণ অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী প্রতিক্রিয়াশীল আওয়ামী লীগ প্রকৃত শ্রেণীগতভাবেই সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করতে অক্ষম। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সশস্ত্র বাঙ্গালী পুলিশ-মিলিটারী ও ই পি আর বাহিনীকে নিরস্ত্র করতে গিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো। এ বিদ্রোহী সশস্ত্র বাঙ্গালী বাহিনী অহিংস নীতিকে পরিত্যাগ করে দেশপ্রেম ও আত্মরক্ষার তাগিদে সশস্ত্র ভাবে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শ্রেণীগত ভাবেই এরা সবাই ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক। সেই সঙ্গে যোগ দিল হাজার হাজার দেশপ্রেমিক আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী, আমলা অফিসার সহ অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী। বুকে তাদের পিতৃভূমিকে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার অদম্য মনোবল, হাতে তাদের শত্রু নিধনের অস্ত্র।

কিন্তু তাদের পরিচালনা করার মত কোন নেতৃত্ব নেই, নেই কৃষক শ্রমিক জনগণের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক কোন সম্পর্ক, ফলে ব্যাপক কৃষক শ্রমিক মেহনতী জনগণের আস্থা লাভে অসমর্থ মুক্তি যোদ্ধাদের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়লো। মরিয়া হয়ে এ মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের উপর দৈহিক চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য হলো।

যেমন পাবনা জেলার নগরবাড়ী ঘাটে ট্রেঞ্চ কাটার জন্য স্থানীয় কৃষকরা একটি কোদাল দিয়েও সাহায্য করতে রাজী হয়নি, রাজী হয়নি ট্রেঞ্চ কাটতে বা পাক সেনাদের যোগযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। অনেকস্থানে মুক্তি ফৌজকে জনগণ আশ্রয় দিতে সাহস করেনি, খাদ্য সরবরাহ করে নি, বা যানবাহন ব্যবহার করতে অনুমতি দেয় নি। মুক্তি ফৌজ ধৈর্যসহকারে এ পরিস্থিতির রাজনৈতিক মোকাবেলা না করে বলপ্রয়োগের চেষ্টা করেছে, যা তাদেরকে জনগণ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করেছে।

জনগণের উপর আস্থা রাখা ও জনগণের উপর নির্ভরশীল হওয়া তাদের রাজনীতিগতভাবে সচেতন করে তোলা এবং তাদের সঙ্গে একাত্ম হবার পরিবর্তে উক্ত মুক্তি ফৌজ, মুক্তিযুদ্ধকে স্বীয় গণ্ডিতে কুক্ষিগত করার এক আত্মঘাতী অহমিকায় মেতে উঠেছিল। এর মূলে ছিল মুক্তিফৌজের সেনাদের মাঝে সঠিক রাজনৈতিক আদর্শের অভাব, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার উপলব্ধির অভাব, জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের অভাব এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব, যার ফলে ওরা হয়ে উঠেছিল স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল এবং বিভ্রান্ত। তাছাড়া অস্ত্র পরিচালনায় অদক্ষতা, পরিকল্পনাহীন ভাবে শত্রুসেনাকে সামনাসামনি মোকাবেলা করার মত ভ্রান্ত কৌশল, শত্রু সেনার শক্তিকে ক্ষুদ্র ভেবে কল্পনার আশ্রয় ও পরিচালকহীন অসংগঠিত অবস্থার ফলে সুসজ্জিত শত্রু সেনাদের বর্বর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। যোগাযোগের অভাব, ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের অভাব, প্রয়োজনীয় রসদ ও খাদ্য সরবরাহের অভাব এবং সর্বোপরি নেতৃত্বের অভাবে তারা ক্রমে ক্রমে তাদের মনোবল হারাতে থাকে।

আওয়ামী লীগের বৃটেন আমেরিকা ও ভারতের উপর নির্ভরশীলতার আশ্বাস প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তি ফৌজের মাঝে মোহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও বাস্তবের কষাঘাতে সে মোহ আজ আর নেই। একমাত্র ভারত সরকারই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিয়েছে, অনুমতি দিয়েছে নিজস্ব ভূমি মুক্তি ফৌজকে ব্যবহার করতে। কিন্তু আর কোন দেশ পূর্ব বাংলার জনগণের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেনি, বরং তাদের স্বার্থে এখনো তারা পাকিস্তান সরকারকে নীরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাচ্ছে মুক্তিফৌজের দিব্যদৃষ্টি, কল্পনা থেকে কঠোর

বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে এ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অর্জন করেছে তা জীবন ক্ষেত্রে তারা গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

আজ তারা বুঝতে শুরু করেছে এ যুদ্ধ হচ্ছে শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে শোসক ও শোষিত শ্রেণীর এক আপোষহীন দ্বন্দ্ব, পরস্পর হিংসাত্মক রক্তপাত। এ যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ যা দ্বারা পূর্ব বাংলার লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনগণকে উগ্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অত্যাচারী শোষক শ্রেণীকে সমূলে উৎখাত করে জাতীয় স্বাধীনতা ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। এটাই হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম আর বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতর এক পর্যায়—শ্রেণী সংঘর্ষ।

বাস্তব অভিজ্ঞতা আজ তাদের শিখিয়েছে পরনির্ভরশীল হয়ে বিশেষ করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বা তাদের অনুচরদের উপর নির্ভর করে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। নিজের জাতি ও দেশের জনগণের মুক্তির যুদ্ধে নিজ দেশের জনগণকেই ব্যাপক ভাব সংগঠিত করে নিজস্ব গণবাহিনী গড়ে তুলে সশস্ত্র গেরিলা পদ্ধতিতেই এ দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব। ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত এবং সশস্ত্র করতে না পারলে, অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধে জনগণকে সমবেত করতে না পারলে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

তাই আজ তারা জনগণের সহায়তায় বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে পাকিস্তানী হানাদার সেনাদের উপর সাফল্যজনক ভাবে আক্রমণ করে চলছে। জনগণের সঙ্গে একাত্মতা, কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ এবং রাজনীতিগতভাবে সচেতন হয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ তারা নিঃসন্দেহ। আওয়ামী লীগ শত প্রচার চালিয়েও তাদের এ সঠিক উপলব্ধি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না এবং পারছে না। ফলে সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন মুক্তিফৌজ ইউনিটগুলির উপর কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, মতান্তর ঘটলেই তাকে "পাকিস্তানী অনুচর" হিসাবে চিহ্নিত করে ভারতীয় পুলিশের নিকট সোপার্দ করা হচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের স্মরণ রাখা উচিত দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের বাস্তব উপলব্ধিকে এ ভাবে দমিয়ে রাখা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, কারণ এটা হচ্ছে বাস্তব ইতিহাসের অমোঘ রায়।

পূর্ব বাংলার মুক্তি যোদ্ধাদের অপর দলটি হচ্ছে মার্কসবাদী

লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে অন্যান্য বাম-পন্থীদের সহযোগিতায় পরিচালিত ঐক্যবদ্ধ একটি বিপ্লবী মোর্চা। যারা পাকিস্তানী শাসন ও শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, সামন্তবাদী শোষণ ও পুঁজিবাদী শোষণ থেকে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও জন-গণের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত। গ্রামে গ্রামে ব্যাপক জনগণকে রাজনীতিগত ভাবে সজাগ, ঐক্যবদ্ধ এবং সশস্ত্র করে সম্পূর্ণ গোপন গেরিলা পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমান যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে পরিণত করে সমগ্র হানাদার সেনা ও তাদের তাঁবেদার শ্রেণীকে সমূলে খতম করাই হচ্ছে এদের রণকৌশল। পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে সাধারণ মেহনতী মানুষের মাঝে মিশে গিয়ে এরা গড়ে তুলেছে তাদের গণবাহিনী। সুযোগ মত যৌথ ভাবে তীব্র অথচ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে এরা হানাদার পাকিস্তানী সেনাদের খতম করে চলেছে, আবার পরক্ষণেই মিশে যাচ্ছে কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতার মাঝে।

এরা অন্যান্য তথাকথিত জাতীয় নেতাদের মত জনগণকে বিপদে ফেলে রেখে নিজেদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায় নি, বরং পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণের পার্টি হিসেবে এরা পূর্ব বাংলার লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনগণের মুক্তির সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, জনগণের অগ্রবাহিনী হিসাবে তাদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের দুঃখকষ্টকে নিজের দুঃখকষ্ট হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং হানাদার শত্রুসেনাদের অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে, উৎসাহ দিচ্ছে, প্রেরণা দিচ্ছে, উদ্দীপ্ত করে তুলছে এবং শক্তি সাহস যোগাচ্ছে। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারার বাস্তব প্রয়োগে পূর্ব বাংলার বুকে এরা গড়ে তুলেছে পূর্ব বাংলার জনগণের নিজস্ব গণবাহিনী। চট্টগ্রাম নোয়াখালি কুমিল্লা, সিলেট, বরিশাল, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং পাবনার বিভিন্ন অঞ্চলে এ গণবাহিনী গড়ে তুলেছে মুক্ত এলাকা, গড়ে তুলেছে তাদের গোপন সামরিক ঘাঁটি। যেখান থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রু-সেনাদের উপর চালাচ্ছে প্রচণ্ড আক্রমণ, খতম করছে পূর্ব বাংলার জনগণের দুশমন পাকিস্তানী সেনা ও তাঁবেদার বাহিনীকে। এ সকল অঞ্চলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মুক্তিফৌজ ও অন্যান্য দলের কর্মীরাও রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়ে দলে দলে শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর সঠিক নেতৃত্বে সমবেত

হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বহন করছে মুক্তিকামী যোদ্ধাদের সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভবিষ্যৎ ইংগিত। এ সকল এলাকার সমগ্র জনগণই আজ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী যুদ্ধের সশস্ত্র যোদ্ধা। তারা দৃঢ় মনোবলে বলীয়ান এবং প্রচণ্ড শক্তিরূপে ঐক্যবদ্ধ। তাদের অসীম সাহস, দৃঢ়মনোবল এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তি আজ প্রমাণ করে চলেছে "জনগণ—কেবলমাত্র জনগণই হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসের পরিচালক শক্তি।" ব্যক্তি স্বার্থ দলীয় স্বার্থ এবং শ্রেণী-স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জাতীয় মুক্তির বৃহত্তম স্বার্থে আজ পূর্ব বাংলার প্রতিটি যুব সেনার অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত এ যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবী গণযুদ্ধ যা নিঃসন্দেহে দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। সুতরাং এ যুদ্ধে ব্যাপক কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক শ্রেণীর জনগণকে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে "দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আত্মবলিদানে নির্ভয় হয়ে, সমগ্র বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করেই বিজয় অর্জন করতে হবে।"

পূর্ব বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামী জনগণের জয় হলেই এ গণযুদ্ধের বিজয় সুনিশ্চিত।

প্রবীর বসু

কর্তৃক

॥ সমালোচনা ॥

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম প্রসঙ্গে

দর্পণ কাগজের কয়েক সংখ্যায়ই শফিকুল হাসান পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক গণ জাগরণে বামপন্থী পার্টিগুলোর ভূমিকা নিয়ে কিছু "তথ্য" সরবরাহ করেছেন। ৪ঠা জুনের সংখ্যায় ভাসানী-তোহা মনোমালিন্যের কিছু কারণও তিনি পাঠকদের অবগতির জন্য রেখেছেন। এদিক থেকে শফিকুলের তথ্য কিছুটা বাস্তবানুগ বলে আমার ধারণা।

তবে পরিস্থিতির সামগ্রিক বিশ্লেষণে শফিকুল হাসান পুরোদস্তুর ব্যর্থ হয়েছেন এবং স্থানীয় ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের প্রতি অধিক নজর দিতে গিয়ে নিজের বিভ্রান্তিকে স্পষ্ট করেছেন এবং বেশ খানিকটা সঙ্কীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন।

শফিকুল হাসান মার্কসবাদী বলে দাবী করেছেন এবং তিনি চেয়ারম্যান মাওয়ের বিখ্যাত উক্তিতে—"পলিটিক্যাল পাওয়ার গ্রোজ আউট অফ দি ব্যারেল অফ এ গান" বিশ্বাস করেন বলে বলেছেন। চেয়ারম্যান মাওয়ের জনযুদ্ধের তত্ত্বে আস্থাবান এবং সম্ভবতঃ চীনের পার্টির আন্তর্জাতিকতার লাইনের অনুগামী শফিকুল সাহেবের গোটা বিশ্লেষণে কেন চীনের পার্টি পূর্ববঙ্গের তথাকথিত অভ্যুত্থানকে শফিকুল বন্দিত ভাসানী সাহেব বা পূর্ব পাকিস্তানের মতিন ও দেবেন শিকদারপন্থী কমিউনিষ্টদের ভাষায় অভিনন্দন জানাতে পারে নি তার কোন জবাব নেই।

কোন দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই মাত্র বিপ্লবের সুনিশ্চিত নির্ধারক নয়। পূর্ব বঙ্গের ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক আঞ্চলিক বৈষম্য, সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় এক অঞ্চলের ভাষাকে অন্য অঞ্চলের ভাষার মনিব রূপে হাজির করা, এ দুটোই যদি কোন জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের একমাত্র নিয়ামক হয়, তাহলে ভারতবর্ষেও অনুরূপ জাতীয়তাবাদী শ্লোগানের জন্য "বাঙ্গালী জাগো, বাঙ্গালী ওঠো" পার্টিকে অভিনন্দন জানাতে হয়, আঞ্চলিক বৈষম্যের জন্য ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলকে "হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ"-এর আওতা থেকে মুক্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হয়। দক্ষিণের তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রের দাবাকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক লাঠির

জোরে অস্বীকার করবার জন্য নাগা ও মিজো পাহাড়ের জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে মিলিটারীর স্টেনগান দিয়ে দমন করবার জন্য, স্বতন্ত্র মাদ্রাজ রাজ্যের ডি এম কে দাবী উপেক্ষা করবার জন্য ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার রূপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রতিটি অর্থ নৈতিক বৈষম্যের শিকার অঙ্গ রাজ্যকে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের জন্য লড়তে হয়।

সামন্ততান্ত্রিক ও ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতিই হলো জনসাধারণের এক অংশকে আরেক অংশের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে লড়িয়ে যাওয়া, কোন একটি অঞ্চলের শোষণলব্ধ রসদে অন্য অঞ্চলকে (বা শোষক শ্রেণীকে সহায়তা করে) আপাতঃ সমৃদ্ধ করা, ধন-কুবেররা যে ভাষাভাষীতে সংখ্যাধিক্য অথবা ক্ষমতাশালী, সে ভাষাকে একটু বেশি মূল্য দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবে ঐ ভাষার শোষিত মানুষকেও দীক্ষা দেওয়া। এর মানে এই নয় যে কোন ধনকুবের গোষ্ঠির সাম্রাজ্যবাদী রীতিনীতি থাকার ফলে সে-ই একমাত্র আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যায়। ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বৈষম্যের জন্য হিন্দীভাষীদের বা গুজরাটী ধনকুবেরদের বা বম্বের ধনকুবেরদের বা ইন্দিরা সরকারকে সাম্রাজ্যবাদী বললে আসল বাস্তবতাকে লুকিয়ে রাখা হবে।

এ যুগের ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রের কোন প্রকার প্রগতিশীল ভূমিকায় যেতে তো পারেই না, বরং পচাগলা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পারস্পরিক মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যুগপৎ শোষিত মানুষের উপর আক্রমণ চালায়। এ জন্যই বর্তমান বিপ্লবের যুগে জনযুদ্ধের যুগে যে কোন জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার লাইনে পরিচালিত না হলে বিপথগামী ও প্রতিবিপ্লবী হতে বাধ্য।

পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকশ্রেণী পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত জনসাধারণকে একরত্তিও রেহাই দেয় না। শোষণের ভাগ বাঁটোয়ারা কি ভারতে কি পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নেতা এবং দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দালালদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

সুতরাং বর্তমান পৃথিবীতে নির্বিশেষে যে কোন আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের শোষিত জনসাধারণের মূল শ্রেণীশত্রুকে তাদের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিভূদের চিহ্নিত করা যে কোন জাতীয় কমিউনিষ্ট

পার্টির অবশ্য কর্তব্য। এবং বৈপ্লবিক জনযুদ্ধের এ যুগে জাতীয় স্তরের শ্রেণী সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক স্তরের শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে নেওয়া বৈপ্লবিক লক্ষ্যসাধন ও প্রতি-বিপ্লবীদের সম্পর্কে সতর্ক হবার দিক থেকে অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

পূর্ব বঙ্গে মুজিবর-ভাসানী নেতৃত্ব যে আন্তর্জাতিক লাইন নিয়েছে, তা প্রতিবিপ্লবী সুবিধাবাদী লাইন। পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণের অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগকে গ্রহণ করে যথার্থ বিপ্লবী পার্টির অনগ্রসরতার অবকাশকে গ্রহণ করে মুজিবর "জয় বাংলা" শ্লোগান দিয়ে বস্তুতঃ জিন্নার পথই অনুসরণ করছে। জিন্না সাহেব ভারতীয় মুসলমানদের আপেক্ষিক দারিদ্র্য ও ও হিন্দু উৎপীড়নের সুযোগ নিয়ে ইসলামের নামে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর পুঁজিপতি ও সামন্ততন্ত্রকে গদীতে বসিয়েছিল। মুজিবর সাহেবও বাঙ্গালী জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে আসলে বাঙ্গালী বণিক ও মুৎসুদ্দিদের শোষণের আসনে বসাতে চেয়েছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাই সুস্থ জাতীয়তাবাদী বিকাশের একমাত্র গ্যারাণ্টি—লেনিনের এ উক্তিকে মনে রেখে পূর্ববঙ্গে শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে মুজিবর-ভাসানী প্রতিবিপ্লবী এবং ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী দালালকে একসঙ্গে উৎখাত করাই শোষিত জনসাধারণের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যবস্তু হওয়া প্রয়োজন। মুজিবর সম্পর্কে শফিকুল সাহেবের কোন অন্ধকার নেই। কিন্তু পঁচিশে মার্চের পরবর্তী ভাসানীর ভূমিকা নিয়ে শফিকুল বিভ্রান্ত। ভাসানী সাহেব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর ও রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ ভৃত্য ইন্দিরা সরকারকে পূর্ব বঙ্গের শোষিত জনসাধারণের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক ঠাউরে নিয়ে অস্ত্রসাহায্যের জন্য তার নিকট ধর্ণা দিয়েছে। একদিকে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে রাঙা নিকসনের হাতকে মর্দন করতে চেয়েছে, অন্যদিকে পৃথিবীর শোষিত জনসাধারণের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও-এর নিকট সাহায্য চেয়েছে। ভাসানী সাহেব শ্রেণী-রাজনীতিকে প্রতিবিপ্লবীদের পায়ে বিকিয়ে দিতে চেয়েছে। মুজিবর-ভাসানী ছাড়া যে কয়টি কমিউনিষ্ট গ্রুপ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের মোকাবিলা করছেন, তাদের নিকট পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের আন্তর্জাতিক লাইন সুস্পষ্ট নয়—অন্তত শফিকুল হাসানের তথ্য থেকেই তা জানা গেল।

অনেক তত্ত্বাগীশ চীনের কুওমিনটাঙ কমিউনিষ্ট জাপবিরোধী যুক্ত-

ফ্রণ্টকে পূর্ববঙ্গের সমসাময়িক অবস্থায় মুজিবর ভাসানী কমিউনিষ্ট যুক্ত-ফ্রণ্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ ধরণের যান্ত্রিক তুলনা তত্ত্ববাগীশদের বেয়াকুব বুদ্ধিরই পরিচয় দেয়। ঐ সময়ে চীনের অবস্থা কি ছিল আন্ত-র্জাতিক স্তরে তখন মুখ্য শ্রেণীশত্রু ফ্যাসিবাদ,—যে ফ্যাসিবাদ প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল নামে মাত্র, আসলে তার লক্ষ্যবস্তু ছিল তৎকালীন সর্বহারা রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যতই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার ধ্বংস কামনা করুক না কেন বিশেষ পরিস্থিতি চার্চিল ও রুজভেল্টকে বাধ্য করেছিল কমরেড স্টালিনের সঙ্গে বসতে এবং আন্ত-র্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী যুক্তফ্রণ্টের অন্তত: নিষ্ক্রিয় (নিউট্রালাইজড) অংশীদার হতে। জাপ ফ্যাসিবাদের আসল শত্রু চীনের অভ্যন্তরে ছিল কমিউনিষ্টরা, কুওমিনটাংরা নয়, তবুও আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রণ্টের লাইন অনুযায়ী মার্কিন পুঁজিবাদের কেনা গোলাম কুওমিনটাং কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট আসতে বাধ্য হয়েছিল (যদিও যুক্তফ্রণ্টের মধ্যেই চিয়াং কাইশেক কমিউনিষ্টদের হত্যা করবার, বিভিন্ন কমিউনিষ্ট ঘাঁটি অঞ্চলকে জাপ ফ্যাসিবাদের সেনাবাহিনীর নিকট চিনিয়ে দেবার ভূমিকা নিয়েছিল)।

বর্তমানে মুজিবর ভাসানী কোন আন্তর্জাতিকতা অনুসরণ করছে? শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিকতা যার বর্তমান আন্দোলন কেন্দ্র লাল চীন—না সংশোধনবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের রুশ আন্তর্জাতিকতা—না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিকতা? জাতীয় ক্ষেত্রে বর্তমান ইয়াহিয়া খানই বা কোন আন্তর্জাতিকতার অনুসারী?

শফিকুল সাহেব এ প্রশ্নগুলোর জবাব যদি খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের নিকট মাত্র দুটো বিকল্প—একটা হলো শ্রেণী সংগ্রামবিহীন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুজিবর ভাসানীর প্রতিবিপ্লব—যে প্রতিবিপ্লব ইয়াহিয়া খানের প্রতিবিপ্লবেরই একটি বাঙ্গালী সংস্করণ এবং যার মূল শত্রু ইয়াহিয়ার প্রতিবিপ্লবেরই মূল শত্রু অর্থাৎ বাংলাদেশের শোষিত চাষী-মজুর মধ্যবিত্তের বৈপ্লবিক শ্রেণীসংগ্রাম, আর অন্যটি হলো শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক জনযুদ্ধের পথ।

কোন বিকল্প পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের গ্রহণ করা উচিত, এবং করলে আবদুল মতিন গ্রুপ বা দেবেন শিকদার গ্রুপকে কেন পূর্ব পাকিস্তান সি পি (এম এল)-এর বর্তমান রাস্তায় আসতে হবে—তা নিশ্চয়ই শফিকুল হাসান

বুঝতে পারবেন, কারণ তিনি মার্কসবাদী এবং আন্তর্জাতিকতার বিপ্লবী লাইনে বিশ্বাসী বলে দাবী করেছেন।

এ পটভূমিকায় পূর্ববঙ্গের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে মহম্মদ তোহার সঙ্গে ভাসানীর সংঘর্ষ অনিবার্য এবং প্রয়োজনীয়। শফিকুল সাহেব তোহার বিরুদ্ধে যে সকল তথ্য সরবরাহ করেছেন, তা কতদূর সত্য জানি না, তবে দুটো তথ্য কেমন গোলমেলে প্রকৃতির। একটা হলো—পূর্ব পাকিস্তান সি পি (এম এল)-এর গেরিলা স্কোয়াডই শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর পর্যায় হিসেবে সুদখোর, জোতদার মহাজনদের খতম করছেন বলে জানতাম, অথচ শফিকুল বলছেন—এ কাজ করছে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি। আরেকটা হলো—শফিকুল সাহেবের মতে মহম্মদ তোহা ন্যাপ-সম্পাদক থাকাকালীন অবস্থায় নাকি আয়ুব খাঁর শাসনকে "প্রগতিশীল" বলেছিলেন যেহেতু আয়ুব খাঁর সঙ্গে লাল চীনের রাষ্ট্রীয় আঁতাত ছিল। কিন্তু ভাসানী বরাবরই আয়ুব বিরোধী ছিলেন বলে তোহার সঙ্গে তাঁর মনান্তর ঘটেছিল। আমাদের খবর তোহা-ভাসানীর পার্থক্য আয়ুব খাঁর চরিত্র চিত্রণ নিয়ে নয়, শ্রেণীসংগ্রামের রূপরেখা নিয়ে এবং আন্তর্জাতিকতার লাইন নিয়ে। তৃতীয় ব্যাপার হলো—শফিকুল খবর দিচ্ছেন ভাসানী সাহেব নাকি সন্তোষে কৃষক সম্মেলনে মার্কিন সি আই এ-র চীন বিরোধী ষড়যন্ত্রের একটা দলিল হাজির করতে চেয়েছিল, ঐ দলিলে নাকি আসাম ও দুই বাংলা নিয়ে একটি সি আই এ নিয়ন্ত্রিত পুতুল সরকার গঠনের প্লান ছিল। ঐ দলিল প্রকাশে নাকি পূর্ব পাকিস্তান সি পি (এম এল) নেতা মহম্মদ তোহা শুধুই অনিচ্ছুক ছিলেন এমন নয়, দলিলটা চেপে দিলেন।

পশ্চিমবঙ্গেও "বিপ্লবী" সি পি এম, চারু মজুমদারকে সি আই এর লোক বলে প্রচার করতে শুরু করেছিল, আর নকশালরা নাকি সব নব কংগ্রেসেরই গুণ্ডাবাহিনী (যারা হাজারেরও অধিক নব কংগ্রেসেরই সরকারের পুলিশ মিলিটারীর হাতে প্রাণ দেয়?) যারা সি পি এম-এর সংশোধনবাদীদের নিধনকার্যে লিপ্ত। এসব প্রচার পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মনে দাগ কাটবে কি না ভবিষ্যতই তার সাক্ষ্য দেবে।

পূর্ব বাংলার বামপন্থীদের সম্পর্কে

(লেখক কর্তৃক সমালোচনার জবাব)

গত সংখ্যার দর্পণে প্রকাশিত শ্রীপ্রবীর বসু কর্তৃক আমার লেখা "পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা" শীর্ষক নিবন্ধের সমালোচনা পড়লাম। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনার জন্য সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনায় মাধ্যমে অবশ্যই আমাদের ভুল ত্রুটিগুলি শুধরে নিয়ে একটি সঠিক বিপ্লবী পথকে আঁকড়ে ধরতে হবে। প্রবীরবাবু তাঁর সমালোচনায় সে প্রচেষ্টাই করেছেন এবং তাঁর এ প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাই। কিন্তু তিনি আমার বক্তব্যের বিপ্লবী সমালোচনা করলেই আমি খুশী হতাম এবং বিপ্লবী জনগণও উপকৃত হতেন। যে কোন বিপ্লবী সমালোচনাই অনুসন্ধান ও তদন্ত ব্যতীত সম্ভব নয়। প্রবীরবাবুর অনুসন্ধান ও তদন্তহীন সমালোচনা তাই একটি মনগড়া ভাববাদী অবাস্তব এবং অবিপ্লবী বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। চেয়ারম্যান মাও বলেছেন—"যে তদন্ত করে না, সমালোচনা করার অধিকার তার নেই।" সুতরাং নীতিগতভাবে প্রবীর-বাবুর সমালোচনার জবাব দেবার ইচ্ছা না থাকলেও পূর্ব বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির সম্যক ও বাস্তব বিশ্লেষণের যাঁরা সুযোগ পাননি তাঁদের উদ্দেশ্যে এবং উল্লিখিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের অবাস্তব মোহমুক্তির কামনায়ই আমি এ সমালোচনার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রবীরবাবুর সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে প্রথমেই আমি বলবো "পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা" নিবন্ধে আমি পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি, তোহা সাহেবদের পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম এল) বা অন্য কোন রাজনৈতিক পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করিনি, নিজের চোখের সম্মুখে পূর্ব বাংলায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনায় বামপন্থী দাবীদার বিভিন্ন পার্টির ভূমিকাকে বর্ণনা করেছি মাত্র, এবং এ ঐতিহাসিক বর্ণনাকে মনগড়া ভাবে বিভিন্ন পার্টির নীতি ও কর্মসূচী হিসাবে মনে করা নিছক অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত এবং অরাজনৈতিক হবে। প্রবীরবাবুর অবগতির জন্যই জানাতে চাই যে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম এল) এবং পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি উভয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গকে ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি এবং তাদের সঙ্গে আমার

পরিচয়ও আছে। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে সাধারণ একজন কর্মী হিসাবে যোগ দেবার পূর্বে আমি তোহা সাহেবদের কমিউনিস্ট পার্টিরই কর্মী ছিলাম। শুধু আমি নই, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পাটির প্রায় সকল সদস্য কর্মী ও সমর্থকরাই এক কালে তোহা সাহেবদের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কর্মী ও সমর্থক ছিলেন। ১৯৬৬ সালে রুশপন্থী সংশোধনবাদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সে তুং-এর চিন্তাধারাকে পার্টির মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু পাক ভারত যুদ্ধের পর আত্মরক্ষার তাগিদে আইয়ুব সরকারের চীন ঘেষা নীতিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রগতিশীল বলে আখ্যা দেন এবং তাদের প্রতি কর্মে সমর্থন জানিয়ে নিজেরা কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির এ নিস্ক্রয়তাবাদী ভূমিকা এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে সমর্থন পার্টির বিভিন্ন কর্মী বিশেষ করে পাবনা ও চট্টগ্রাম জেলা কমিটি তীব্রভাবে সমালোচনা করেন এবং সমগ্র জনগণকে রাজনৈতিক সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে শোষক ও শাসক শ্রেণীকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করে বুর্জোয়া রাষ্ট্র যন্ত্রকে সমূলে বিধ্বস্ত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জনগণের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার মূল বিপ্লবী দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় কমিটির এ নিক্রিয়তাবাদকে তাঁরা নয়া, সংশোধনবাদী কার্যকলাপ রূপে অভিযুক্ত করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের এ ভূমিকাকে পার্টির সিদ্ধান্ত বিরোধিতার অভিযোগে ১৯৬৮ সালে মতিন, আলাউদ্দিন, আবুল বাসার ও দেবেন শিকদার সহ চট্টগ্রাম পাবনা, কুমিল্লা, রংপুর. নোয়াখালি, ঢাকা, ময়মনসিংহ. যশোর এবং বগুড়া জেলা কমিটির বহু সদস্যকে পার্টি থেকে বহিস্কার করে দেন। এ সকল বিপ্লবী কর্মীরা মোঃ তেহার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিস্কৃত হয়েও শহর ও গ্রামে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৬৯ সালের মধ্যেই এঁরা মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সে তুংএর চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে কৃষক শ্রমিক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিদের সমন্বয়ে গড়ে তোলেন পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি। এ পার্টির প্রতিটি সদস্য কর্মী ও সমর্থকগণ নিঃসন্দেহে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ও মাও সেতুংএর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। শুধু তাই নয় ১৯৭০ সালে পার্টির বিশেষ কংগ্রেসে কমরেড

চারু মজুমদারের প্রয়োগ পদ্ধতিকে পার্টির রণকৌশলের অন্যতম মূল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রবীরবাবু আমাকে শুধুমাত্র মার্কসবাদী বলে উল্লেখ করেছেন এবং বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথকে অনুসরণ না করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। সঠিকভাবে সামগ্রিক সংবাদ না জেনে অন্যান্য যে কোন বক্তব্যই যে বিভ্রান্তিকর এবং অসত্য তা আশা করি এবার থেকে প্রবীরবাবু উপলব্ধি করবেন।

বস্তুতঃ মোহম্মদ তোহার পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) এবং পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মূল নীতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোন পার্থক্যই ছিল না। উভয় পার্টিই সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও সেতুং-এর চিন্তাধারা ও কমরেড চারু মজুমদারের প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসারে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবী চিন্তায় বিশ্বাসী। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণে তাদের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মোহম্মদ তোহারা পাকিস্তান-ভিত্তিক কৃষি বিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন আর পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করেন পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী।

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামগ্রিক সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থিতি ও জনগণের শ্রেণী চেতনা এবং সর্বোপরি বিপ্লবী পার্টির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ইত্যাদি কতগুলো বাস্তব অবস্থার কারণেই বর্তমান পাকিস্তান ভিত্তিক কৃষি বিপ্লব পরিচালনা করার পরিকল্পনাকে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির একজন মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী কর্মী হিসাবে আমি অবাস্তব ও অসম্ভব এবং অতীত অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলনহীন বলে মনে করি। বাস্তবে পূর্ব বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি কিছু কিছু অবস্থার সঙ্গে মিল থাকলেও পূর্ব বাংলার ব্যাপক বিপ্লবী পরিস্থিতি কোনক্রমেই ভারতের অনুরূপ ছিল না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতির সঙ্গে তার কোন বাস্তব সম্পর্কই ছিল না।

পাকিস্তানের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে আধা সামন্ত-তান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক পূর্ব বাংলার জোতদার শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ঐ সকল সামন্ত শ্রেণীর (বিশেষতঃ হিন্দু সামন্তশ্রেণী) দেশত্যাগের

ফলে পূর্ব বাংলায় যে জোতদার এবং ধনী ও মাঝারি কৃষক শ্রেণীর বিকাশ ঘটে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ গত তেইশ বছরে পূর্ব বাংলায় একটি বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাঝে সীমিত হলেও বিপ্লবী চেতনা বিদ্যমান। ফলে শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ আন্দোলনই এই বিরাট সংগ্রামী মধ্যবিত্তশ্রেণী দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু সংগ্রামী নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার মত ক্ষমতা মধ্যবিত্ত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেই, বিপ্লবী নেতৃত্ব পরিচালনা করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব হচ্ছে সর্বহারা কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর। কিন্তু পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৎকালীন অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণেই সেখানে কোন বিপ্লবী নেতৃত্বের উপস্থিতি ছিল না। পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্তশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ এ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তাদের নেতৃত্বে সমবেত করতে সক্ষম হয়। এ পরিস্থিতি জন্য আমি কোন ক্রমেই পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে দোষারোপ করবো না, বরং এর মূলে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এ কারণেই পরবর্তীকালে পার্টিতে মতান্তর ও ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিপতিরা (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) তাদের পুঁজিবাদী শোষণের নিমিত্ত সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়। একই সঙ্গে সেখানের জনগণের উপর বিরাজ করতে থাকে প্রচণ্ড সামন্তবাদী শোষণ। ফলে সেখানে এক বিরাট সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে সজাগ ছিল এবং এ শ্রমিক শ্রেণী যাতে সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। বেকারত্ব যাতে শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে শোষক গোষ্ঠী বিনা প্রয়োজনেই মরুভূমির উপর মঙ্গলা তারবেলা ওয়ার্সাক ইত্যাদি বালির বাঁধ নির্মাণ ও বিভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থানান্তরের কর্মে তাদের নিয়োজিত করে এবং অপেক্ষাকৃত বেশী পরিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে (একজন সাধারণ শ্রমিকের দৈনিক মজুরী পূর্ব বাংলায় ২.২৫ টাকা ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪.৫০) এ সমস্যার মোকাবেলা করে আসছে। এমন কি

সেখানে এখন পর্যন্তও শ্রমিক শ্রেণীর কোন বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠতে পারেনি।

পূর্ব বাংলার জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পাকিস্তানী পুঁজি-পতিরা (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) যে শোষণ নিপীড়ন চালিয়ে আসছে তার চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। পাকিস্তানের বাৎসরিক আয়ের ৭৩ ভাগ সম্পদই পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত, অথচ ব্যয়ের খাতে পূর্ববাংলার ভাগ্যে জুটতো বাৎসরিক বাজেটের মাত্র ১৯.৫ ভাগ। প্রবীরবাবু একে আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক বৈষম্য বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পূর্ব বংলার জনগণকে শোষণ করে শোষক গোষ্ঠী কখনোই তা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের জন্য ব্যয় করে নি, বরং বৃহত্তর পুঁজি গড়ে তারা তাদের শোষণের পথকে আরো প্রশস্ত করেছে মাত্র।

সুতরাং একে আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক বৈষম্য বলা কোনক্রমেই সঠিক হবে না, বরং নিঃসন্দেহে ইহা একটি পুঁজিবাদী শোষণ। এখন প্রশ্ন হলো এ শোষণের চরিত্র কি? এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে পাকিস্তানী একচেটিয়া পুঁজিপতিরা (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি অর্থাৎ ধর্মকে পুঁজি করে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রথমেই আক্রমণ করে পূর্ব বাংলার হিন্দুপ্রধান সামন্ত ও পুঁজিবাদী শ্রেণীকে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে তাদের জমি সম্পত্তি দখল করে ক্ষমতাসীন এ পুঁজিবাদী শোষক শ্রেণী ইজারাদারী ও তহশীলদারী প্রথার মাধ্যমে সামন্তবাদী শোষণকেও নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসে এবং দুই বৎসরের মধ্যেই বাৎসরিক দেড় কোটি টাকা দেয় রাজস্বকে বাড়িয়ে সাড়ে ১৮ কোটি টাকায় পরিণত করে। জোতদার মহাজন শ্রেণীগুলিও তাদের এ উলঙ্গ শোষণ থেকে রেহাই পায়নি। তাছাড়া আইয়ুবী আমলে "মৌলিক গণতন্ত্র" নামে এক অদ্ভুত শাসন-শোষণমূলক আইনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রায় সকল জোতদার মহাজন শ্রেণীকেই বেতনভুক সরকারী আমলায় পরিণত করা হয়। এভাবে পুঁজিবাদীরা পূর্ব বাংলায় জোতদারী ও মহাজনী শোষণকে সীমিত করে নিজেদের পুঁজির শোষণের কলেবর বৃদ্ধি করতে থাকে। অপর দিকে পূর্ববাংলার পুঁজি-পতিদের (যারা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু) বিতাড়িত করে তাদের কলকার-খানাগুলিও পাকিস্তানী অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা দখল করে

নেয়। এদের মধ্যে ঢাকেশ্বরী কটন মিল, চিত্তরঞ্জন কটন মিল, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল, চন্দ্রঘোনা পেপার মিল, দর্শনার সুগার মিল, সোনার বাংলা জুট মিল, তুলারাম জুট মিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এমনি করেই পূর্ব বাংলার ৩৭৪টি বড় ও মাঝারি মিল ফেক্টরীর মধ্যে ৩৩৮ টিরই মালিক হয়েছে পাকিস্তানী তথা পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা। এমন কি পাকিস্তানের মোট ৩৪টা ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর ৩৩টির মালিক ছিল তারাই। শুধু তাই নয় পুঁজিবাদী কায়দায় তারা পূর্ব বাংলার কুটির শিল্পসমূহ, যথা তাঁত শিল্প, বিড়ি শিল্প, মৃৎ শিল্প, চামড়া কাঠ ও লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদি ইত্যাদিকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এই সব কারণে বাঙ্গালী সামন্ত ও পুঁজিবাদী শ্রেণী এক দারুণ সঙ্কটে নিপতিত হয়। আইয়ুবশাহীর যে কয়টি কার্যকলাপকে মোঃ তোহা সাহেবরা "প্রগতিশীল" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার সামন্ত ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী তথা পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিবাদীদের এ শোষণমূলক দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে পূর্ব বাংলার সামন্ত ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর সীমিত শোষণই পূর্ব বাংলার বিরাট এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের মূল কারণ। কিন্তু কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী জনগণকে বিপ্লবী রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধ এবং সশস্ত্র করার পরিবর্তে সামন্ত ও উঠতি পুঁজিবাদী শোষণকে একচেটিয়া পুঁজিবাদী শোষণের মাধ্যমে সাময়িক ভাবে দমিয়ে রেখে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটানো নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক দায়িত্ব নয়, এধরণের কার্যকলাপ কখনোই মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী হতে পারে না এবং একে প্রগতিশীল বলাও নিঃসন্দেহে ভুল।

রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে দেখা যাবে পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন শোষকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার কোন শ্রেণীকেই কোনদিন রাজনৈতিক অধিকার দেয়নি। জনগণের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিকে করেছে অবৈধ, কেড়ে নিয়েছে সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগণের বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতাদর্শের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা। ভারতের তথাকথিত গণতন্ত্রের মত কোন গণতন্ত্র পূর্ব বাংলায় কখনো ছিল না, ১৯৫৪ সালে এবং ৭০ সালে তথাকথিত নির্বাচনের নামে শাসকগোষ্ঠী জনগণের সঙ্গে করেছে চরম প্রতারণা, তথাকথিত গণরায় কার্যকরী হয়নি কখনো। বরং দু-দুবার সামরিক শাসন জারী করে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর সেনাবাহিনীর দ্বারা ধনিক ও সামন্ত শ্রেণী সহ পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিটি আশা আকাঙ্খাকে

অঙ্কুরেই নির্মমভাবে নিষ্পেষণের মাধ্যমে হত্যা করে, অব্যাহত রেখেছে তাদের শোষণের লুণ্ঠন কার্য। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাষার উপরও পুঁজিবাদী কায়দায় (প্রবীরবাবুর মতে সামন্তবাদী কায়দায়, কিন্তু সামন্তবাদী কায়দায় বিশ্বের এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন ইতিহাস আমার জানা নেই) আক্রমণ করেছে, এমন কি ইংরেজ প্রভুরা যেমন ঘৃণাভরে ভারতীয়দের "নেটিভ" ইত্যাদি বলে গাল দিত ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী কায়দায় ইসলাম ও ভ্রাতৃত্বের ধ্বজাধারী পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শোষক গোষ্ঠী ও তাদের দালাল শ্রেণী পূর্ব বাংলার জনগণকে-"বাস্টার্ড সানস অফ হিন্দুজ" বলে ঘৃণা প্রদর্শন করে আসছে। এমন কি ধর্মের নামে সামাজিক জীবনকেও তারা অতিষ্ঠ করে তুলেছিল (মসজিদ নির্মাণ মিলাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জোর করে চাঁদা আদায় করা, স্বাস্থ্যগত কারণে অপরাগ হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে রোজা বা উপবাস করতে বাধ্য করা ইত্যাদি)। পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণীর (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) এ সকল শোষণকে সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করে আমি বলবো এটা নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক শোষণ কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রবীরবাবু আমাকে পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদ বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন, যা আমি বলিনি! ঔপনিবেশিক শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এ দুয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সবদিক চিন্তা না করেই তিনি আমাকে সঙ্কীর্ণতাবাদী বলেছেন। আশা করি এরপর প্রবীরবাবুর ভুল ভাঙবে।

দ্বন্দ্ব নির্ধারণে চেয়ারম্যান মাও বলেছেন,

"When reactionary forces and its running dogs stand on one pole and the people stands on the other—thus forms the principal contradiction."

পূর্ব বাংলার জনগণ এখন প্রতিক্রিয়াশীল শোষকদের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পক্ষ অবলম্বন করে পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা না করলে পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান মাও সে তুং এর নির্ধারিত দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণকেই অস্বীকার করা হবে। কিন্তু মোহম্মদ তোহা সাহেবদের কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করায় জনগণ বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্তশ্রেণীর উগ্রজাতীয়তাবাদী

প্ররোচনায় সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ বিভ্রান্ত এ জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে এবং তাদের নিপীড়নের মুখে ঠেলে দিয়ে আপোষের পথে শোষণের ক্ষেত্র ভাগের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী তোলে। তোহা সাহেবদের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের এ ভূমিকাকে প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু জনগণ তখন সংগ্রামের পথে নেমেছে, শুধু মাত্র নিন্দাবাদেই তারা সন্তুষ্ট নয়, তাদের দাবী ছিল বাস্তব ও সুস্পষ্ট একটি কর্মসূচী। এমন এক জটিল পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার বিপ্লবীরা নিম্নের কোন্ ভূমিকাটি গ্রহণ করবে তা নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়—

(এক) ভবিষ্যতে পাকিস্তান ভিত্তিক বিপ্লব সম্পন্ন করার উদ্দেশ্য পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন শোষক পুঁজিবাদী শ্রেণীকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে আওয়ামী লীগ তথা পূর্ব বাংলার সামন্ত ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামকে বানচাল করা।

(দুই) ভবিষ্যতে পাকিস্তান ভিত্তিক বিপ্লব সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বর্তমান এ সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় থেকে পরোক্ষ ভাবে শাসক গোষ্ঠীর সহযোগিতা ও আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করা।

(তিন) আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে পাকিস্তানী শোষকদের থেকে পূর্ব বাংলা মুক্ত করে ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলা ভিত্তিক বিপ্লব করা।

(চার) পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীকে উৎখাত করে বর্তমানেই বিপ্লবী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা।

তোহা সাহেবদের পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তান ভিত্তিক বিপ্লবের এক অবাস্তব এবং অসম্ভব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভিত্তিতে বাস্তব অবস্থার সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে চতুর্থ পথটি বেছে নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা ১৯৭০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার এগারো দফা ভিত্তিক একটি বাস্তব কর্মসূচীও জনগণের সম্মুখে তুলে ধরেন। কমরেড চারু মজুমদারের প্রয়োগ পদ্ধতিকে অন্যতম রণকৌশল হিসাবে গ্রহণ করে পূর্ব বাংলার

কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলারা একই সঙ্গে সামন্ত ও সেনা বাহিনীর শ্রেণী ও জাতীয় শত্রুদের খতম করতে শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে প্রবীরবাবু বলেছেন তিনি নাকি শুধু তোহা সাহেবদের শ্রেণীশত্রু খতমের সংবাদই শুনেছেন। বাস্তবে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলারাই যশোর জেলাতে প্রথম শ্রেণীশত্রু খতম অভিযান শুরু করেন, তাদের প্রথম এ্যাকশান বার্থ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় এ্যাকশনে যশোরের কালীগঞ্জ থানার কুখ্যাত অত্যাচারী জোতদার মুসলীম লীগের থানাপ্রধান চাঁদ আলীকে খতম করে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম পূর্ব বাংলায় শ্রেণী সংগ্রামের সূচনা করেন। তৃতীয় এ্যাকশন ঘটে পাবনা জেলার চর অঞ্চলে।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির এ তিনটি এ্যাকশনের পর তোহা সাহেবদের পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) তাদের খতম অভিযান শুরু করেন এবং খুলনা যশোর ময়মনসিংহ ও নোয়াখালীতে শ্রেণী-শত্রুদের খতম করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলাদের শ্রেণীশত্রু খতম অভিযান চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রংপুর, পাবনা ও যশোরের আরো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পাবনা শহরের গুণ্ডাপ্রধান অত্যাচারী বদমাইশ আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আহাম্মদ রফিককে খতম করার পর ক্ষিপ্ত আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যেই তাদের ফ্যাসিষ্ট বাহিনীকে বিভিন্ন এলাকার কমিউনিস্টদের উপর লেলিয়ে দেয় এবং পাবনা শহরের পার্টি সমর্থক ডাঃ দাক্ষী ও হারুনূর রসিদ নামক একজন ছাত্রকে হত্যা করে। ফলে পাবনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে কয়েক দফা সশস্ত্র সংঘর্ষেরও সূত্রপাত হয়। পুলিশ এবং ই পি আর বাহিনী শ্রেণীগত চরিত্রের কারণেই আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে ও কমিউনিস্টদের উপর ব্যাপক নিপীড়ন চালাতে থাকে, পার্টির গেরিলারা সশস্ত্র ভাবেই তাদের মোকাবেলা ও প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ঢাকা শহরে এ পার্টির গেরিলা যোদ্ধারা গত মার্চ মাসের ছয় এবং নয় তারিখে সেনা-বাহিনীর উপর আক্রমণ করে যথাক্রমে একজন সশস্ত্র সেনা ও ক্যাপ্টেনকে খতম করে এবং তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ফলে সেনাবাহিনীও উক্ত পার্টির উপর তাদের বর্বর আক্রমণ অত্যাচার চালবার চেষ্টা করে। এভাবেই মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার

কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্বাংলার বিপ্লবী জনগণ ও তাদের জাতীয় ও শ্রেণী শত্রুদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে সক্ষম হন।

অপর দিকে বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ না করেই তোহা সাহেবরা পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি ভারতের অনুরূপ, পূর্ব বাংলার বিপ্লব ভারতের বিপ্লবেরই অংশ, সুতরাং কমরেড চারু মজুমদার যখন স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ কায়েম করবেন তখন সে সঙ্গে পূর্ব বাংলাও মুক্ত হয়ে যাবে—এ ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য আমদানী করেন এবং তার অবসম্ভাবী ফল স্বরূপ জনগণের আস্থা হারাতে থাকেন। বস্তুতঃ নিজেদের এলাকার জনগণকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব এলাকার পরিস্থিতি অনুযায়ী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করার দায়িত্ব অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়ে মোহাম্মদ তোহারা পূর্ব বাংলার বিপ্লবের দায়িত্বও কমরেড চারু মজুমদারের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এরাই ১৯৬৮ সালে নকশালবাড়ীর বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে হঠকারিতা বলেছিল, আবার পিকিং রিভিউতে মহান চীনের সমর্থন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মত পাল্টিয়ে বিপ্লবী কার্য বলে অভিনন্দন জানিয়েছে, এরাই আইয়ুব ইয়াহিয়ার চীন ঘেঁষা নীতিকে প্রগতিশীল বলে অভিহিত করে জনগণের নেতৃত্ব থেকে পার্টিকে সরিয়ে রেখেছে, এরাই পাকিস্তানী শাসক ও শোষক চক্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে সমঝোতার মাধ্যমে একটি অবৈধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির বৈধ মুখপত্র "গণশক্তি" প্রকাশ করার অনুমতি পেয়েছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত সে পত্রিকায় পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিবাদী ২৩টি পরিবারের দুই পরিবার এম এম ইস্পাহানী ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রচার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হতো, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে তারা উক্ত পার্টির গোপন কার্যকলাপ, এমন কি প্রেস ও লাইব্রেরীর সন্ধান এ পত্রিকা "গণশক্তি"তে প্রকাশ করে পার্টির বিপ্লবী কর্মীদের পুলিশ ও মিলিটারীদের বর্বর হামলার শিকার করার মত জঘন্য কার্যে তারাই লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রফেসার আসহাবউদ্দিনের হুলিয়াও তোহা-ইয়াহিয়া গোপন সাক্ষাতের পর সমঝোতার মাধ্যমেই প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

প্রবীরবাবু সমালোচনায় মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে আমার বিভ্রান্তিকর মোহের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবেই মওলানা ভাসানীকে জাতীয় বুর্জোয়া বলে উল্লেখ করেছি। চেয়ারম্যান মাও সে তুং বলেছেন

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, তারা তাদের দোদুল্যমান চরিত্রের জন্য বিপ্লবীদের মিত্র অথবা শত্রু উভয়ই হতে পারে। সুতরাং বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীশত্রু বলার কোন অবকাশ নেই। মাওলানা ভাসানী তার রাজনৈতিক পার্টি ন্যাপে অবৈধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টিকে তাঁদের দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়ে, তাঁর কৃষক ফ্রন্ট, শ্রমিক ফ্রন্ট, ছাত্র ফ্রন্ট, এমন কি রাজনৈতিক পার্টি ন্যাপকে কমিউনিস্টদের প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে দিয়ে তিনি কি বিপ্লবীদের মিত্র হিসাবে পরিচয় দেন নি? তাঁর এ বিপ্লবী মিত্রের পরিচয় পেয়েই মহান চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং স্বয়ং দুবার মাওলানা ভাসানীকে তাঁর দেশে আমন্ত্রণ করেছেন। গত নির্বাচনে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেও মাওলানা ভাসানীই এককভাবে সে সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়ে বিপ্লবীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। এর জন্য হাজী দানেশ নূরুলহুদা কাদের বক্সের মত বহু প্রভাবশালী সদস্যের পদত্যাগকেও তিনি পরোয়া করেন নি। এহেন মাওলানা ভাসানীকে হঠাৎ প্রতিবিপ্লবী বলে তাঁকে শত্রু শিবিরে ঠেলে দেবার অর্থ কি? আমি জানতে চাই মোহাম্মদ তোহারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করেছেন, না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করছেন? বিপ্লব পরিচালনা করার দায়িত্ব কি জাতীয় বুর্জোয়াদের, না বিপ্লবীদের? দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব কর্মসূচীর অভাবে বিপ্লব পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে, বিপ্লব না করার অপরাধে জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী বলে দোষারোপ করা কি নিজেদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দেবার ব্যর্থ প্রয়াস নয়? তোহা সাহেবদের মত প্রবীরবাবু মুজিবর ও ভাসানীকে একই প্রতিক্রিয়াবাদী সারিতে ফেলেছেন। কিন্তু তা মোটেও সঠিক নয় কেননা মুজিবর বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের সহযোগী পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল মুৎসুদ্দী ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর পরিচালক, সুতরাং শেখ মুজিবর প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী সন্দেহ নেই, কিন্তু পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে তিনি নিশ্চয়ই জানেন, মাওলানা ভাসানীর সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী একটি শক্তিশালী ভূমিকা আছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন প্রসঙ্গে প্রবীরবাবুর সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে আমি বলবো বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করার পূর্বেই

আন্তর্জাতিক সমর্থনের আশায় হা পিত্যেশ করা কোনক্রমেই আমাদের উচিত নয়। যে রাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের জনগণকে পরিচালনা করতে অক্ষম সে অথর্ব পার্টিকে সমর্থন করার কি অর্থ থাকতে পারে—যেমন করছে মস্কোর সংশোধনবাদীরা? কিন্তু তাতে কি জনগণের শ্রেণীচেতনা বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত হয়?

প্রবীরবাবু বলেছেন—"সামন্ততান্ত্রিক ও ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতিই হলো জনগণের এক অংশকে আরেক অংশের সঙ্গে কোন ভাবে লড়িয়ে যাওয়া।" আশ্চর্য! তিনি কি বলতে চান পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে লড়াই করছে! তিনি কি পাকিস্তানের (পশ্চিম পাকিস্তানের) বর্বর অত্যাচারী সেনাবাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বলতে চান! আর এটা যদি সামন্ত ও ধনিক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রই হয় তবে কি বলতে হবে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্ত শ্রেণী অর্থাৎ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে? কেননা সেনাবাহিনীর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল তারাই! পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানী শোষক ও শাসকদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করছে। তার মানে এই নয় যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গেও তাদের বিরোধ আছে, যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কোনক্রমেই মার্কিন জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বুঝায় না। তবে "শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক জনযুদ্ধের পথই" যে পূর্ব বাংলার জনগণের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির একমাত্র পথ প্রবীরবাবুর এ বক্তব্যে আমি সম্পূর্ণ একমত, এবং মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী কর্মীরা এই একই পথে অগ্রসর হচ্ছেন। সুতরাং অদূর-ভবিষ্যতে এই পার্টিই সশস্ত্র বৈপ্লবিক গণযুদ্ধের মাধ্যমে জনগণের মুক্তির পথ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে পূর্ব বাংলার মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন এবং তখনই তাঁরা আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন আশা করবেন। নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা না করে পরমুখাপেক্ষী ও সাহায্যকামী হয়ে থাকাকে আমি সুস্পষ্ট সংশোধনবাদী, চরম সুবিধাবাদী ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পরিপন্থী বলে মনে করি।

পূর্ব বাংলার বর্তমান গণযুদ্ধ পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে আমি আমার বক্তব্যে পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী দেশপ্রেমিক জাতীয়-ধনিক শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে তাদের নিজস্ব মৌলিকত্ব ও

স্বকীয়তা বজায় রেখেই পূর্ণ গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব করেছি-কোন প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে নয়। কিন্তু প্রবীরবাবু আমার এ বক্তব্যের যথার্থ অর্থ এবং পূর্ব বাংলার বর্তমানে পরিস্থিতিতে এর অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পুরাদস্তুর ব্যর্থ হয়েছেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে চীনের বিপ্লবী ফ্রণ্টে কুও মিন টাং বাহিনীর ভূমিকা হতে বিপ্লবী অভিজ্ঞতা গ্রহণকরার উপদেশ না দিয়ে, তৎকালীন পরিস্থিতি ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবান্তর তর্ক জুড়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিরোধীতা করেছেন। পূর্ব বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামগ্রিক বিপ্লবী পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে শুধু মাত্র ভারতীয় বিপ্লবী পরিস্থিতির দৃষ্টিকোন্ থেকে দেখা পূর্ব বাংলা সম্পর্কে প্রবীরবাবুদের এই বিশ্লেষণ—মারাত্মক ভাবে ভুল এবং বিভ্রান্তিকর, বিপ্লবের স্বার্থেই পূর্ব বাংলার জনগণ একে গ্রহণ করতে পারেনা কেননা পূর্ব বাংলার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি কোন ক্রমেই ভারত বা পশ্চিম বাংলার অনুরূপ নহে, সুতরাং তাদের পরিস্থিতি অনুসারে পূর্ব বাংলার বিপ্লবীদের করণীয় নির্ধারণ করতে চাইলে তা ভুল হতে বাধ্য এবং পূর্ব বাংলার যুদ্ধরত জনগণ কখনোই এরূপ ভুল করবেন না। প্রবীরবাবু অন্যত্র-জাতীয় স্বাধীনতার প্রসঙ্গে আমাদিগকে উগ্রজাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একই আসনে বসাতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল—পূর্ব বাংলার জনগনের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা বা মুক্তি অর্জনের সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব শ্রেণীগত চরিত্রের কারণেই উগ্র জাতীয়তাবাদীরা দিতে পারে না, এ মহান দায়ীত্ব ঐতিহাসিক ভাবেই কৃষক শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণী ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিদের উপর অর্পিত হয়েছে এবং বর্তমানে তারা সে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রবীরবাবুরা তাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হয়তো ভুলে গেছেন—কমরেড মাও সে তুং এর মহান বানী—"চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জাতীয় সংগ্রাম হচ্ছে-শ্রেণী সংগ্রামেরই এক সমস্যা", কিন্তু আমরা পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণ ভুলিনি, ভুলতে পারিনা, কারণ সমস্যাটা আমাদের এবং এর সমাধান আমাদেরই করতে হবে। প্রবীরবাবুরা, আশাকরি নিশ্চয়ই জানেন, জনগণের গণতন্ত্র বা জনগণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা জনগণের সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং এ বিপ্লব কোনক্রমেই জাতীয়তাবাদী বা

উগ্রজাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে সম্পন্ন হতে পারে না;—কেবলমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুং এর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী একটি সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির বিপ্লবী নেতৃত্ব কৃষক শ্রমিক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি ও দেশ প্রেমিক জাতীয় ধনিক শ্রেণীকে রাজনীতিগত ভাবে সচেতন করে, বিপ্লবের মহান লাল পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ সুসংহত এবং ব্যাপকহারে সমবেত করেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। আশাকরি আমাদের সম্পর্কে প্রবীরবাবুদের সকল বিভ্রান্তিকর ধারণার অবসান ঘটবে।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সেতুং-এর চিন্তাধারার বাস্তব প্রয়োগে "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" প্রতিষ্ঠার গণযুদ্ধ চলছে এবং দীর্ঘদিন চলবে। পূর্ব বাংলার জনগণ আজ তাঁদের জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে খতম করে চলেছেন তাঁদের জাতীয় শত্রু—পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনীকে, শ্রেণী শত্রু সামন্তবাদী শোষক গোষ্ঠীকে এবং সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী অনুচর প্রতিক্রিয়াশীল দালালশ্রেণীকে। সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র মূলক চক্রান্তকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করে পূর্ব বাংলার এই বিপ্লবী শক্তি দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবেই, জনগণের এই মুক্তিযুদ্ধ বিজয় লাভ করবেই। দীর্ঘজীবি হোক আমাদের এই বিপ্লবী গণশক্তি, দীর্ঘজীবি হোক আমাদের প্রিয় পিতৃভূমি—"স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা", দীর্ঘজীবি হোক আমাদের এই মহান-জনযুদ্ধের বিজয়, দীর্ঘজীবি হোক—পূর্ব বাংলার মহান জনগণের মহান পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি।

॥ সমালোচনা ॥

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম প্রসঙ্গে

দর্পণে প্রকাশিত শফিকুল হাসানের দুটি প্রবন্ধ পড়লাম। পূর্ববঙ্গের অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদ যতটুকু জানি, সেই বিচারে, এম এ মতিন, শিকদার, আলাউদ্দীন প্রমুখ কমরেডদের পরিচালিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির যে বিশ্লেষণ (পূর্ব ও পশ্চিমের পার্থক্য) নিঃসন্দেহে সঠিক মনে করি। না, ব্যক্তিগত কল্পনা নয়—এটাই বাস্তব। তবুও কয়েকটি বিষয় জানতে চাই তাঁর কাছে। জানালে এ দেশের বিপ্লবী জনগণ খুবই উপকৃত হবেন।

১। দাঙ্গা ও সামন্ত শ্রেণীর দেশত্যাগ প্রভৃতির ফলে সামন্ত অবস্থার ভাঙন ঘটে। ফলে মাঝারী ও ধনী কৃষকের উদ্ভব ও মধ্যবিত্তের বিকাশ। শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত নগণ্য হলেও শোষণ শাসনের ফলে তার বিপ্লবী চেতনা বিদ্যমান (বিশেষতঃ বিপ্লবী যুব ছাত্ররা, যারা অগ্রগামী অংশ, তারা তো এই শ্রেণী থেকেই এসেছেন)। অতএব, এদের সংযুক্ত মোর্চা গঠন করে গ্রামাঞ্চলে মার্ক্সবাদ-মাও সে তুং চিন্তাধারা জনগণের মধ্যে প্রচার করে, ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে গেরিলা প্রস্তুতি নিচ্ছেন?—না, চারুবাবুর ব্যক্তি-হত্যার রাজনীতি নিচ্ছেন? কেননা এই ব্যক্তিহত্যা সন্ত্রাসবাদ—মার্ক্সবাদ নয়। তাছাড়া সত্যিকারের ফিউডাল বলতে যা বোঝায় (য়ুরোপ ও চীনে) তা দু বাংলাতেই নেই। এরা কিছু জমির সাময়িক মালিকমাত্র নিলাম হয়ে গেলেই সব নিঃস্ব। আর একটা প্রধান কথা বাংলার কৃষি অর্থনীতি কিছু কিছু জমি নিয়ে এক একজন ছোট জোতদার বা ধনী কৃষকদের মাধ্যমে পরিচালিত। এরা কি শ্রেণী শত্রুর পর্যায়ে পড়ে? সর্বোপরি, এদের ব্যক্তি বিশেষকে হত্যা করলে রাষ্ট্রযন্ত্রের কণাটুকুও খসে না। সিস্টেমের পরিবর্তনই আসল উদ্দেশ্য কমিউনিস্টদের। সেটা সম্ভব রাষ্ট্রযন্ত্র যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে তাকে আঘাত করে। পশ্চিমী যে সব মালিকরা রয়েছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে বরং তাদের আঘাত করা চলতে পারে, কিন্তু সেটা মুখ্য লক্ষ্য নয়। সশস্ত্র প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবী আক্রমণ এটাই বিপ্লবী-দের কাজ। তা সম্ভব ব্যাপক মাও চিন্তাধারা প্রচার করে জনগণের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের সশস্ত্র করে গ্রামে ঘাঁটি (গেরিলা ট্রেনিং গোপনে সংগঠিত করে) গড়ে শহরগুলিকে দখল করা। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পরিকল্পনা নেওয়া। এ বাংলায় ব্যক্তিহত্যা ও স্কুল কলেজ আক্রমণ, মূর্তি ভাঙা প্রভৃতি করে

বিপ্লবীরা জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষ এখন নকশাল বলে ব্যঙ্গ করে। এখানে চারুবাবুর নেতৃত্ব মুখে মাওবাদী, কাজে চে-বাদী হয়ে উঠেছে। এমন কি গত এক বছরে শহরে এই অহেতুক সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পর চীন রেডিও কোন সাড়াশব্দ করে না। আপনারাও কি এই ভুল পথে যাবেন ?

২। বুর্জোয়ারা বিভিন্ন সময়ে সুযোগ গ্রহণ করে জনতার প্রকৃত বিপ্লবকে দমন করতে প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলে, তেমনই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে পা দিয়ে মুজিব বাংলার জনগণকে বিপথে চালিত করলেন। এই অবস্থায় তোহা ও আপনারা কি করছেন ? এ কথা ঠিক সংগঠিত হবার আগেই এমন আক্রমণের প্রতিরোধ করা যায় না (আগুনে হাত পা বেঁধে ঝাঁপ দেয়াও ঠিক নয়) তবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় তো দ্রুত সংগঠন গড়া যায়। তোহার সঙ্গে যত বিরোধই থাক সংযুক্ত মোর্চা গড়ে গ্রামে গেরিলা ঘাঁটি গড়ে তুলুন। গোপন তথ্য ফাঁস করতে বলছি না, তবে এধরণের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন কি ? না করলে তো চীন বিরোধী ভাল ঘাঁটি তৈরি হবে। হতে চলেছে ! চীন বিরোধী প্রচার ও চীনের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য জনগণ কিভাবে নিচ্ছেন ? কমিউনিস্টরা তো সংগ্রাম করেই নেতৃত্বে চলে আসেন। আপনারা কি নিষ্ক্রিয় আছেন বা থাকবেন ? যদিও এটা প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত, তবু এটা সশস্ত্র প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবী গেরিলা আক্রমণের একটা সুবর্ণ সুযোগও তো বটে ? শেখ মুজিব যে ভয় পেয়েছিলেন দুবছরের মধ্যে দেশটা কমিউনিস্ট হয়ে যাবে, একমাত্র আমিই পারি ঠেকাতে কমিউনিজমকে। মুজিবুর রহমানের এ ভয় কি আপনারা আভ্যন্তরীণ বিরোধে বা সংগ্রামে সামিল না হয়ে নষ্ট করে দেবেন ? সংগ্রামে সামিল হয়েছেন কি না জানি না ; তবে সি পি আই (এম এল) ও দেশব্রতী লেখে পূর্ব বাংলায় বিপ্লবীরা এ যুদ্ধে অংশ নেয়নি—কথাটা কি ঠিক ? হাজার হাজার শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতা যেখানে মারা যাচ্ছেন সেখানে এদের বাঁচাতে প্রতিরোধ আন্দোলন অর্থাৎ সেনা বাহিনীর সরাসরি আক্রমণকে রোধ করা উচিত নয় আপনাদের ? এই বিপদে যদি না এগিয়ে আসেন তবে জনগণ কি করে সমর্থন করবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও সে তুঙ চিন্তাধারাকে। বিশ্বজোড়া চীন বিরোধী যে প্রচার বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে হচ্ছে তার সঠিক মূল্যায়ণ করবেন না ? অথচ আপনাদের দেশের জনতা এখন ও প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় সেনাদের তাদের প্রধান সহায়ক ও

বন্ধু মনে করেছেন। ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জোয়াদের মধ্যে বিরোধ বাঁধানো বৃটিশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের (সি আই এ-এর) বড় চক্রান্ত। এই চক্রান্তের জালে বাঁধা মজিবুর রহমান। কিন্তু আজকের আমেরিকা বৃটেনের গোপনে ও প্রকাশ্যে অস্ত্র দেওয়ায় আওয়ামী লীগ কেডাররা মনের দিক থেকে মার্কিন বিরোধী হতে বাধ্য, এই অবস্থায় তাদের মধ্যে সঠিক রাজনীতি দিয়ে সশস্ত্র করে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে বলে মনে করি। আপনার অভিমত কি ?

জনৈক কমরেড
বালিগঞ্জ

॥ সমালোচনার জবাবে লেখক ॥

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম ও বামপন্থীরা

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম প্রসঙ্গে গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত বালিগঞ্জের জনৈক কমরেডের সমালোচনা ও প্রশ্নসমূহের জবাব দিতে গিয়ে আমি উক্ত প্রশ্নকর্তাকে অনুরোধ করবো কোন রচনা বা বক্তব্য সম্পর্কে সমালোচনা মন্তব্য বা প্রশ্ন করার পূর্বে ঐ রচনা বা বক্তব্যের সম্পূর্ণটুকু গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে তার মূল বক্তব্য সম্যক ভাবে উপলব্ধি করেই সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন এবং সে সম্বন্ধে যথাযথ প্রশ্ন তুলে ধরুন। আমার অসম্পূর্ণ বক্তব্য পড়েই আপনি যে সব প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর উক্ত রচনার শেষাংশেই দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি দর্পণে প্রকাশিত আমার অন্যান্য রচনাগুলিতে অবশ্যই আপনার সকল প্রশ্নের জবাব আপনি পাবেন। তবুও আপনার কয়েকটি বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আপনি লিখেছেন, "সত্যিকারে ফিউডাল বলতে যা বোঝায় (য়ুরোপে বা চীনে) দু বাংলাতেই তা নেই।" জানতে চেয়েছেন আমরা চারুবাবুর ব্যক্তি হত্যা রাজনীতি করছি কিনা এবং গ্রামে গ্রামে গেরিলা ট্রেনিং-এর ঘাঁটি নির্মাণ করছি কিনা। এই প্রসঙ্গে আমরা বলবো য়ুরোপ বা চীনে যে ধরনের সামন্ত প্রভুরা ছিল দু বাংলায় সে ধরণের সামন্ত প্রভুরা নেই সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক সমাজের উপর (যারা জনগণের পঁচাশি ভাগ) বর্তমানে যে শোষণ চলে আসছে তা কি ঐ সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে না? জোতদার, মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার মজুতদার ঠিকাদার ও তাদের দালালশ্রেণী রূপে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণী আজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সামন্তবাদের এ অপভ্রংশ শ্রেণীই রাষ্ট্রীয় সহায়তায় (পুলিশ-মিলিটারী আইন, আদালত) সামন্তবাদী কায়দায় মেহনতী কৃষক সমাজকে ক্রমাগত শোষণ করে যাচ্ছে—এক কথায় এরা সম্মিলিত ও যুক্ত প্রচেষ্টায় মুমূর্ষু সামন্তবাদী শোষণকে বাঁচিয়ে রেখেছে। জনগণের উপর শতধা বিভক্ত এ সামন্তশ্রেণীর শোষণ এবং দালালধনিক শ্রেণীর সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির কারণেই এ দেশ নিঃসন্দেহে একটি আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ"।

এই আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক দেশের গ্রামগুলিতে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে মার্কস লেনিন ও মাও চিন্তাধারা প্রচার করে গেরিলা ট্রেনিং-এর যে কোন প্রচেষ্টা কি এ সকল স্থানীয় শোষক শ্রেণীর মাঝে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না? তারা কি জনগণের এ সশস্ত্র অভ্যুত্থানে ভীত হয়ে তাদের রক্ষিবাহিনী পুলিশ মিলিটারী আইন ও আদালতের সাহায্য চাইবে না? পুলিশ মিলিটারী তথা বুর্জোয়া রাষ্ট্র শক্তি কি জনগণের এ বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক ফ্যাসীবাদী প্রচেষ্টা চালাবে না? এ সশস্ত্র হানাদার পুলিশ ও মিলিটারীর গুপ্তচর তথা মিত্র হিসাবে যারা কাজ করবে তারা কি বিপ্লবী জনগণ ও বিপ্লবের শত্রু প্রতিবিপ্লবী শ্রেণী নয়? বিপ্লবী জনগণ ও বিপ্লবের স্বার্থে এসকল ঘৃন্য প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী গণবিরোধী শ্রেণী শত্রুদের গেরিলা পদ্ধতিতে খতম করে গ্রামে গ্রামে মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করার ও পরে গ্রাম থেকে শহরগুলোকে দখল করার এ মহান তত্বকে আপনি কি ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি বা সন্ত্রাসবাদ বলে উড়িয়ে দিতে চান? শ্রেণী সংগ্রামের এ তত্ত্বানুসারে শোসক শ্রেণীর বর্তমান শ্বেত সন্ত্রাসের বদলে মেহনতী জনতার বিপ্লবী লাল সন্ত্রাস অবশ্যই সৃষ্টি হবে যা শুধুমাত্র জনগণের শ্রেণীশত্রু ঐ সকল স্থানীয় শোষকদেরই ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলবে জনগণকে নয়। বরং তাঁদের শত্রুদের নির্মূল হতে দেখে তাঁরা উল্লাসিত হবেন এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই বিপ্লবী সংগ্রামে এগিয়ে যাবেন। তাছাড়া যে সকল গেরিলা ইউনিট এ সব শ্রেণী সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করবেন ভবিষ্যতে তাঁরাই আরো সুশৃঙ্খল হয়ে উন্নতর ট্রেনিং এর মাধ্যমে গড়ে তুলবেন জনগণের গণফৌজ যে গণফৌজ ব্যতীত কোনরকমেই সশস্ত্র প্রতিক্রিয়াকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। আশাকরি শ্রেণী সংগ্রামের এ মহান তত্ত্বের ব্যাপক তাৎপর্য ও বিশালতা সম্বন্ধে বালিগঞ্জের কমরেড অতঃপর একটি সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হবেন। অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদেরই শ্রেণীস্বার্থে বিপ্লবকে প্রতিহত করতে বিপ্লবী নেতৃত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করতে মহান তত্ত্বকে বিকৃত করে অপব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার নিতানতুন অপকৌশলে সামগ্রিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তুলবে (যেমন বরেছে কলকাতায়); কিন্তু তার জন্য নিশ্চয়ই বিপ্লবী নেতৃত্ব বা ঐ মহান তত্ত্ব দায়ী নয়, বরং ঐ রূপ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিকে প্রতিটি বিপ্লবী কমরেডের দৃঢ় ভাবে মোকাবিলা করা উচিত।

আর এক স্থানে আপনি লিখেছেন, "তোহার সঙ্গে যত মতবিরোধই থাক, সংযুক্ত মোর্চা গড়ে তুলুন।" দেখুন কমরেড, পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সঠিক মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী পথে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও জনগণতন্ত্রের যে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ চলছে তা নিঃসন্দেহে একটি বিপ্লবী যুদ্ধ। বিপ্লবী যুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষের স্থান নেই, সকল জনগণই এ বিপ্লবী গণযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা। জনগনের এ গণযুদ্ধে সকল জনগণকেই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। বিপ্লবী দ্বার রুদ্ধ করার মত ক্ষমতা (বিশেষতঃ বিপ্লবীদের জন্য) কারো নেই। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নিয়মানুযায়ী পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি সমগ্র জনগণের জন্যই বিপ্লবী দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন। জনগণ বলতে পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক শ্রেণীকে তাঁরা বুঝিয়েছেন এবং এ জনগণের শত্রু হিসাবে তাঁরা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী, সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ও ফ্যাসীবাদী শ্রেণী এবং তাদের তাঁবেদার দালাল বাহিনীকে চিহ্নিত করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনগণ তাঁদের এ শত্রুদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং সে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে একমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমে (ইউনিটি ্ স্ট্রাগল)। ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমেই তাঁরা গড়ে তুলবেন স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা।

পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রাম

পূর্ব বাংলার বীর বিপ্লবী জনগণ আজ তাদের জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামকে এক দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার লাঞ্ছিত নিপীড়িত মেহনতী জনগণ সৃষ্টি করে চলছেন এক যুগান্তকারী সংগ্রামী ইতিহাস। কোরিয়া ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও প্যালেষ্টাইনের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হলো আর একটি সংগ্রামী নাম—পূর্ব বাংলা। আজ পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনগণ যে শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করছেন তার চরিত্র কি এবং কোন ধরনের শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি জাতি (যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ) সামগ্রিক ভাবে অস্ত্র ধারণ করেছেন? এ সম্পর্কে সম্যক ও বাস্তব জ্ঞান না থাকলে শোষক শ্রেণীর সঙ্গে জনগণের সঠিক দ্বন্দ্ব নির্ধারণে ভুল হতে পারে এবং দ্বন্দ্ব নির্ধারণে ভুল হলে এ সংগ্রাম যথার্থ সার্থকতা বহন করতে ব্যর্থ হবে। কারণ জনগণের গণযুদ্ধ হচ্ছে অত্যাচারী শোষক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত নির্যাতিত শ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী যুদ্ধ, আপোষহীন সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম—মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্মত একটি প্রয়োগশীল বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুনগুলো (সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ও মূলনীতি, সুস্পষ্ট রণনীতি সময়োপযোগী রণকৌশল, যথোপযুক্ত রণক্ষেত্র ও সঠিক শত্রু মিত্র নির্ধারণে এবং রাজনৈতিক সচেতন-সুশৃঙ্খল গণবাহিনী পরিচালনায় সক্ষম সর্বহারা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শনিষ্ঠ একটি বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব) অবশ্যই বিপ্লবী জনগণকে মেনে চলতে হবে, তা না হলে সামগ্রিক বিজয় লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে। বর্তমান গণযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভের জন্য পূর্ব বাংলার জনগণকেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। পূর্ব বাংলার বর্তমান গণযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি খুঁজলে দেখা যাবে যে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ছিল এই সংগ্রামের সূচনা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কবলিত ভারতবর্ষের জনগণের মূল সমস্যা ও করণীয় ছিল—(১) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন ও শোষণের কবল থেকে জাতীয় মুক্তি তথা পাক ভারতের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব অর্জন এবং (২) সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে সামাজিক মুক্তি তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে জনগণের স্বনির্ভরশীল উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন

কিন্তু ভারতবর্ষের ধনিক ও সামন্তশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ নিজেদের মধ্যে শোষণের ক্ষমতা ও ক্ষেত্র বন্টন করে নেবার উদ্দেশ্যে দ্বিজাতি তত্ত্বের উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে আপোষের পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে শোষণ ক্ষমতাকে বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শোষকেরা আপোষের পথে পাকভারতের শাসন ক্ষমতা তাদের স্বার্থরক্ষাকারী শ্রেণীমিত্র এই দুই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের হাতে হস্তান্তর করে। আপোষের পথে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অমাবর্সীয় অবৈজ্ঞানিকভাবে অর্জিত পাকিস্তান ও ভারতের তথাকথিত এই স্বাধীনতা জনগণকে বিদেশী পুঁজির শোষণ থেকে বিন্দুমাত্র রেহাই দেয়নি, বরং নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে শোসকশ্রেণীর সংখ্যা এবং শোষণের তীব্রতাই বৃদ্ধি করেছে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ক্ষমতাসীন পাকিস্তানের আমলা মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণী (যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেও স্বাধীন নিজস্ব জাতীয় পুঁজির বিকাশ না করে স্বীয় স্বার্থে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকেই নিজ দেশে বিনিয়োগ করে) তাদের নিজ স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পূর্বের চেয়েও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শোষণ কবলিত পাকিস্তান তথাকথিত স্বাধীনতার নামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এক নয়া উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশে পরিণত হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানের এই শাসক ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে সামন্তশ্রেণীর দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও স্বীয় পুঁজিবাদী শোষণকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে স্বনির্ভরশীল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন প্রচেষ্টা তারা করে নি (মুৎসুদ্দি চরিত্র বিশিষ্ট শোষক ও শাসকরা তা করতে পারেও না), কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের নামে সাম্প্রদায়িকতা ভিত্তিতে হিন্দু সামন্তশ্রেণীকে উৎখাত করে নিজেরাই সে শোসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সংস্কারবাদী প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলে তৎকালীন জমিদার ও সামন্ত প্রভু দল অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় সত্য, কিন্তু সরকার অনুগত জোতদার মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার, ঠিকাদার, মজুতদার ও তাদের তাঁবেদার বাহিনী রূপে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণী শতধাবিভক্ত হয়েও সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় (পুলিস, মিলিটারা, আইন-আদালত) বাঁচিয়ে রেখেছে

সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে যার প্রচণ্ড শোষণ পূর্ব বাংলার জনগণকে এক সর্বহারা জাতিতে পরিণত করেছে। ফলে পাকিস্তানে সত্যিকার জাতীয় মুক্তিবিপ্লব বা গণতান্ত্রিক বিপ্লব কোনটাই সম্পন্ন হয় নি। এভাবে জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক।

আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদীদের দ্বারা কখনোই সে দেশের জাতীয় পুঁজি বিকশিত হতে পারে না। মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা ঋণের মাধ্যমে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি সংগ্রহ করে নিজদেশে খাটিয়ে তার লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেয় এবং এর পারিশ্রমিক হিসাবে নিজেরাও সে লভ্যাংশের কিছুটা পেয়ে থাকে। এভাবে নিজস্বার্থে এরা নিজেদের দেশের জনগণের সামগ্রিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে থাকে। এরা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল, এরা জাতীয় শত্রু তথা জনগণের শত্রু। পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরাও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যেই তারা সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের কাছ থেকে মোট পঁয়ত্রিশ শত কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে (যার পরিমাণ পাকিস্তানের বাৎসরিক জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ) এবং পরিণামে বিরাট অংকের সুদ দানের মাধ্যমে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা করে আসছে। অবশ্য এই ফাঁকে তারা নিজেরাও নিজদের ব্যক্তিগত পুঁজি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের ঋণ গ্রহণ করে তার লভ্যাংশের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ ক্রমাগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি দাঁড়া করানো এক বিরাট কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই দ্রুত পুঁজি গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তানী ক্ষমতাশীল মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদী কায়দায় নিজ দেশেরই জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা উৎপাদনশীল অংশ পূর্ব বাংলার সকলশ্রেণীর জনগণের উপর চালাতে থাকে প্রচণ্ড এক ঔপনিবেশিক শোষণ। শোষণের রূপ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ তাদের এ একচেটিয়া পুঁজির শোষণ থেকে বিন্দুমাত্র রেহাই পায় নি। ইসলাম, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি, শক্তিশালী কেন্দ্র এবং শিশুরাষ্ট্রের নামে এই ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে তারা কেড়ে নিয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণের সকল মৌলিক অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, মতাদর্শের স্বাধীনতা,

ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিল্পীর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তাদের প্রতিটি আশা আকাঙ্খাকে বুলেট বেয়নেট দ্বারা নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে. পৈশাচিক বর্বরতার সঙ্গে স্তব্ধ করে দিয়েছে এ শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর প্রতিটি সংগ্রামী কণ্ঠকে। কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী জনগণ যাতে শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রেণী সংগ্রাম তথা বিপ্লবী যুদ্ধের সূচনা করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে অকথ্য শোষণ নিপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়েছে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার অধিকার। কায়েমী স্বার্থবাদী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রাম যাতে সূচিত ও সংগঠিত হতে না পারে সে জন্য মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জঘন্য উদ্দেশ্যে অতি সুপরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ চালানো হয় পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষা, শিল্প কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক মতামতের উপর।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষকরা পূর্ব বাংলার উঠতি ধনিক শ্রেণী (যারা পূর্ব বাংলার জাতীয় এবং মুৎসুদ্দি ধনিক) ও সামন্ত শ্রেণীসহ পূর্ব বাংলার জনগণের উপর যুগপৎ আক্রমণ করে পূর্ব বাংলার অর্থনীতির উপর হানে মারাত্মক আঘাত। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল সরকার নিজেই সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় অতি কদর্য শোষকের চেহারায়। শিল্পকারখানাগুলি থেকে সুকৌশলে বাঙালী মালিকদের অপসারণ করে সেগুলোকেও তারা দখল করে নেয়। নিজেদের পুঁজির বিকাশের জন্য তারা পূর্ব বাংলার কুটির শিল্পকেও ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। শুধু তাই নয় ক্ষমতাসীন কায়েমী স্বার্থবাদী পাকিস্তানী শাসক ও শোষকগোষ্ঠী সমাজের প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে বিরাট এক বৈষম্যমূলক আচরণে লিপ্ত হয় এবং শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে যাতে তারা বিপ্লবী বিদ্রোহ করতে না পারে তার জন্য প্রথম থেকেই অতি সতর্কতার সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণকে নিরস্ত্র করে রাখে।

কিন্তু শোষকদের প্রতি ইতিহাসের রায় বড় নিষ্ঠুর। যেখানেই শোষণ নিপীড়ন সেখানেই শ্রেণীভেদ, আর এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণীচেতনাই শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মাঝে প্রথমে শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং পরবর্তীকালে সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের সূচনা করে। পূর্ব বাংলার ইতিহাসও এই একই ধারায়

প্রবাহিত। দমন পীড়ন দ্বারা শোষক ও শাসকরা সাময়িকভাবে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্তশ্রেণীকে দমন করেছে, পূর্ব বাংলার বাঙ্গালী ধনিক শ্রেণীর (মুৎসুদ্দি বা জাতীয়) পুঁজিকে বিকশিত হতে দেয় নি এবং বাঙ্গালী সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়েছে সত্য, কিন্তু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের দমন বা নিশ্চিহ্ন করতে তারা পারে নি। বরং গত তেইশ বৎসরের ক্রমাগত শোষণ নিপীড়নের ফলে পূর্ব বাংলার জাতীয় ধনিকরা তাদের পুঁজি হারিয়ে সামন্ত ধনিক কৃষকরা তাদের জমি হারিয়ে এবং কিছু সংখ্যক ধনী ও মাঝারী কৃষকদের সন্তান সন্ততিরা লেখাপড়া শিখে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্ব পরিচালিত পূর্ব বাংলার এই জাতীয় ধনিক ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য এবং তাদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অপর দিকে পূর্ব বাংলার মুৎসুদ্দি ধনিক ও সামন্তশ্রেণী তাদের শোষণের ক্ষেত্রকে পুনরুদ্ধারের আশায় তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ ৬ দফার মাধ্যমে পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন আমলা মুৎসুদ্দি ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে এক আপোষের প্রচেষ্টা চালায়। "জয় বাংলার" উগ্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে বিভ্রান্ত করে তারা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি শ্রেণী সহ পূর্ব বাংলার জনগণের একটা বিরাট অংশকে তাদের সপক্ষে টানতে সক্ষম হয়। মুৎসুদ্দি চরিত্র বিশিষ্ট পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ কখনোই পূর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ এবং সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কোন আহ্বান জানায় নি, শ্রেণীগত চরিত্রের জন্য তা জানাতেও পারে না। বাস্তবে পাকিস্তানী শাসক শোষক গোষ্ঠীর মিত্র রূপেই তারা চেয়েছিল একই পাকিস্তানের কাঠামোতে আপোষের পথে শোষণের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতিবিপ্লবী। তারা তাদের শ্রেণী চরিত্রের জন্যই সর্বদা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি-কমিউনিষ্ট পার্টির তীব্র বিরোধিতা করেছে, অনেকক্ষেত্রে তাদেরকে আক্রমণও করেছে, জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে, জনগণতান্ত্রিক চীন ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েটের বিরোধিতা করেছে এবং পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী আমেরিকা ও বৃটেনের প্রতি তাদের সৌহার্দ্য, নির্ভরশীলতা এবং আনুগত্য প্রকাশ করেছে। ফলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সশস্ত্র শত্রু হিসাবে

চিহ্নিত না করে তাদেরকে দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি হিসাবে ধরে নিয়ে, তাদের দেয়া তথাকথিত নির্বাচনের প্রহসনে অংশ গ্রহণ করে, "অহিংসা ও অসহযোগের" গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহের পথে আওয়ামী লীগ ৬ দফা আদায়ের দাবীতে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনগণ "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র গণযুদ্ধের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ফলে আওয়ামী লীগের ৬ দফার আপোষ ফর্মুলার দফারফা করে পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনী তাদের সামগ্রিক মারণাস্ত্র নিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গেরিলা পদ্ধতিতে জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ, যা বর্তমানে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গণযুদ্ধের রূপ লাভ করেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পাকিস্তানী শাসক ও শোষক গোষ্ঠী মেহনতী জনগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রের সেতুবন্ধ কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে তাদের শ্রেণী সংগ্রামের পথে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। গোপনে গড়ে ওঠা কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিও বাস্তবতার কষ্টিপাথরে সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে জনগণকে পরিচালনা করার পরিবর্তে তারাই জনতা দ্বারা বাহিত হতে থাকে এবং ঘটনার পেছনে লেজুর বৃত্তিই তাদের প্রধান কর্ম হয়ে দেখা দেয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে দেউলে নীতির পরিচয় দেয় মস্কোপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (বর্তমান বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি)। প্রথম থেকেই এরা আওয়ামী লীগের লেজুর বৃত্তি করতে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে তাদের ও আওয়ামী লীগের মধ্যে "পার্টির নাম," "কমিউনিজম" "মার্কস-লেনিন" ইত্যাদি প্রয়োগহীন শব্দসমষ্টি ছাড়া আর কোন পার্থক্যই ছিল না। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, (এম এল) নামধারী পার্টি পূর্ব বাংলার সামগ্রিক ও বাস্তব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ না করে পূর্ব বাংলায় ভারতের বিপ্লবী রাজনীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করে এবং তা যান্ত্রিক ভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করে। তারা অবিভক্ত পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিষ্ট সেনাবাহিনীর ইতিহাসের ঘৃণ্যতম কার্যাবলীকে প্রগতিশীল বলে বর্ণনা করে। জনগণের শত্রু হানাদার সেনাবাহিনীর ঘৃণ্যতম কার্যাবলীকে তাদের নিঃশর্ত সমর্থন পূর্ব বাংলার জনগণেরই বিরুদ্ধে কার্যকরী হয়েছে এবং তারা তাদের এই

বামপন্থী বিচ্যুতির জন্য পূর্ব বাংলার ইতিহাসে সেনাবাহিনীর নৃশংস গণহত্যা, লুণ্ঠতরাজ, অগ্নি সংযোগ এবং নারী ধর্ষণের মত ঘৃণ্যতম কার্যাবলীর সমর্থনকারী সহযোগী হিসাবেই পূর্ব বাংলার জনগণের ঘৃণা কুড়াবে। মহামতি লেনিনের বক্তব্য—

"It is beyond doubt that any national movement can only be a bourgeois democratic movement, since the overwhelming mass of the population in the backward countries consist of peasantry who represent bourgeois-capitalist relationships. It would be utopian to believe that proletarian parties in these backward countries can pursue communist tactics and a communist policy, without establishing definite relations with the peasant movement and without giving it effective support... We, as the communists, should and will support Liberation movements—only when they are genuinely revolutionary, and when their exponcuty do not hinder our work of educating and organising in a revolutionary spirit the peasantry and the masses of the exploited"—(Lenin, Collected Works, Vol-31, P-241 on Report of ' Commission on the National and the Colonial Questions.)

একে তারা উপলব্ধির অভাবে নীতিগতভাবে বর্জন করে মহান লেনিনের মূল্যবান উপদেশ তথা লেনিনবাদের মৌলিক-তাকেই অস্বীকার করে চলেছে।

কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি, পূর্ববাংলার জনগণের সঙ্গে সামন্তবাদের দ্বন্দ্বকেই প্রধান বলে মনে করে। পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পাকিস্তানী শোষণকে তারা "বৃহৎ বিজাতীয় পুঁজির জাতিগত নিপীড়ন, যে পুঁজি ঘটনাচক্রে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছেন" বলে মনে করে। পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসাবে তারা মনে করে না। অথচ তারাই আবার পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতার কথা বলে বর্তমান যুদ্ধকে বলে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ। কিন্তু পূর্ব বাংলা যদি উপনিবেশই না হবে তবে জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন আসে কি করে? পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন গ্রুপটি শুধু মাত্র পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতার কথা বলে কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে সামন্তবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে তাদের কোন

সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। ফলে তারাও বাম পন্থীবিচ্যুতিতে নিপতিত। এরাও মহান মাও সে তুংএর মূল্যবান উপদোশবলী

"In a struggle that is national in character, the class struggle takes the form of national struggle, which demonstrates the identity between the two. On one hand, for a given historical period the political and economic demands of the various classes must not be such as to disrupt co-operation ; on the other hand, demands of the national struggle should be the point of departure for all class struggle. Thus there is identity in the united front between unity and independence and between the national struggle and class struggle." (Selected Works, Vol. 2, P-215).

এবং অন্যত্র

"The same is true of the relationship between the class struggle and the national struggle. It is an established principle that in the war of resistance everything must be subordinated to the interests of resistance. Therefore the interests of the class struggle must be subordinated to and must not be conflict with, the interests of the war of resistance. But classes and class struggles are facts, and those people who deny the facts of class struggle are wrong, we do not deny the class struggle, we adjust it." (Selected Works, Vol. 2, P-200.)

কে উপপদ্ধির অভাব হেতুই বাস্তব প্রয়োগে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে বস্তুতঃ মার্ক্সবাদ লেনিনবাদকেই অস্বীকার করে চলেছে।

পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থী নামধারী এ সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এখনো অনুধাবন করার প্রচেষ্টা করেছেন না যে পাকিস্তানী শাসক ও শোষক,স াম্রাজবাদী শোষক ও সামন্তবাদী শোষকগোষ্ঠী পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে আক্রমণ চূড়ান্ত ভাবে বিপ্লবের সাফল্য আনতে সক্ষম হবে না। পূর্ব বাংলায় পাকিস্থানী হানাদার সেনাবাহিনীকে অক্ষত রেখে যেমন সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণকে উৎখাত করা সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় সামন্তবাদী শোষণকে বজায় রেখে পাকিস্তানী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে উৎখাত করে পূর্ব বাংলার

জাতীয় মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এ তিন শত্রুর যে কোন একটি বর্তমান থাকার অর্থই হলো শোষণের অবস্থান তথা জনগণের দুঃখ দুর্দশার উপস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংগ্রামের সংগে সংগে শ্রেণীসংগ্রামকে অবশ্যই চালিয়ে নিতে হবে এবং শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতেই এই তিন শোষক শত্রু শ্রেণীকে মোকাবেলা করতে হবে। অথচ বামপন্থী নামধারী উপরোক্ত পার্টি ও গ্রুপগুলি তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ও সামগ্রিক পরিস্থিতির বাস্তব বিচার বিশেষণের দূরদর্শিতার অভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের সামগ্রিক মুক্তির সঠিক পথে অগ্রসর না হয়ে দক্ষিণ ও বামপন্থী বিচ্যুতিতে ভুগছেন।

১৯৬৮ সালের শেষভাগে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ও মাও সে তুংএর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পূর্ব বাংলার শ্রমিক কৃষক সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতক সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি। পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র গণযুদ্ধের পথে "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। এতদসত্ত্বেও এই পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে পাকিস্তানী শোষণের চরিত্র, জনগণের সঙ্গে শোষক শ্রেণীর মূল দ্বন্দ্ব, বিপ্লবের চরিত্র, বিপ্লবের অবস্থা পরিস্থিতি বিপ্লবের সঠিক পথ ও রণনীতি রণকৌশল নির্ধারণে ছিল বিভিন্ন দোদুল্যমানতা। তারাও পূর্ব বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তথাপি তারা পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে জনগণের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু প্রথম থেকেই জাতীয় মুক্তির প্রশ্নকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি, আবার অনেকেই শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পণ করেন। ফলে পার্টির ভিতরেই বামপন্থী বিচ্যুতি বিরাজ করতে থাকে। তবে বেশ কিছু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মী সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে একটি সঠিক মার্কসবাদী লেনিনবাদী পথে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে অন্যান্য পার্টি কর্মীরাও তা মেনে নিয়েছেন।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টদের এমনিতর সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগ পূর্ব বাংলার সামন্ত ধনিক শ্রেণী তথা আওয়ামী লীগ পুরোপুরি গ্রহণ করে এবং উগ্রজাতীয়তাবাদের আড়ালে পূর্ব বাংলার জাতীয় ধনিকসহ মধ্যবিত্ত বুদ্ধি-

জীবিদেরকে তাদের নেতৃত্বে সমবেত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু জাতীয় মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র গণযুদ্ধের সূচনা হতেই নেতিবাচক আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জনগণের নিকট মর্যাদা হারাতে থাকে। পূর্ব বাংলার সর্বহারা জনগণের রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের ভিত্তিতে এমনি এক সমস্যাপূর্ণ বিপ্লবী অবস্থায় পূর্ব বাংলার জনগণের এই সংগ্রামকে সশস্ত্র দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী গণযুদ্ধে রূপ দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্পে সশস্ত্র শত্রু শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজনীতি সচেতন জনগণকে সশস্ত্রভাবে পরিচালনা করে।

মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ হচ্ছে একটি প্রয়োগসাপেক্ষ সৃজনশীল বিজ্ঞান। সঠিক পথে পরিচালিত হলে ইহা অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে। তাই জনগণের বিজয় অর্জনের জন্য চূড়ান্ত সফলতার জন্য মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পূর্ব বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতি, জনগণের সঙ্গে মূল দ্বন্দ্ব, বিপ্লবের চরিত্র, শত্রু মিত্র ও কর্তব্য নির্ধারণ ইত্যাদি অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে।

পূর্ব বাংলার বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা হলো পাকিস্তানী শাসক শোষকদের প্রেক্ষিতে "ঔপনিবেশিক", সাম্রাজ্যবাদী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শোষকদের প্রেক্ষিতে "আধা বা নয়া ঔপনিবেশিক" এবং আভ্যন্তরীণ বহু বিভক্ত সামন্তবাদের প্রেক্ষিতে "আধা সামন্ততান্ত্রিক"। এরূপ সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় পূর্ব বাংলার বর্তমান বিপ্লবের চরিত্র দুটি (১) পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্নে ইহা "জাতীয় মুক্তি বিপ্লব" এবং (২) আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্নে ইহা "গণতান্ত্রিক বিপ্লব"। পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি পরিচালনা করা অসম্ভব এবং এই দুই বিপ্লবকে একই সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে বলে একত্রে একে "পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব" বলা যেতে পারে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলত "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব", যা জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সম্পন্ন হবার কথা। কিন্তু বহুদিন আগে থেকেই বিশ্বব্যাপী পরিসরে এই বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে নিজস্বার্থে উক্ত বিপ্লবী দায়িত্ব পালনের নেতৃত্ব থেকে সরে গেছে। পূর্ব বাংলার জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীও এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে না

এবং ঐতিহাসিক ভাবেই এ দায়িত্ব পালনের ভার মেহনতী জনগণের পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টির উপর অর্পিত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় উহা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই একটি স্তর। কমরেড মাও সে তুং এ বিপ্লবকে "নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব" বা "জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব" বলে আখ্যায়িত করেছেন। পূর্ব বাংলার এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল শত্রু প্রধানতঃ তিন গোষ্ঠী—(১) পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক শোষক গোষ্ঠী, (২) নয়া ঔপনিবেশিক শোষক গোষ্ঠী তথা সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং (৩) দেশীয় সামন্তবাদ তথা জোতদার, মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার, মজুতদার ইত্যাদি।

এই তিন শত্রুর পরস্পরের স্বার্থ কিছুটা ভিন্ন হলেও শোষণের ক্ষেত্রে এরা অভিন্ন। পূর্ব বাংলার জনগণের দুঃখ কষ্টের মূল এই তিন শত্রুকে একই সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে হবে, সমাজ জীবন থেকে সমূলে উৎখাত করতে হবে, চূড়ান্তভাবে নির্মূল করতে হবে। একমাত্র তখনই পূর্ববাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যলাভে সক্ষম হবে। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই তিন শত্রু পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, পরস্পর পরস্পরের মিত্র। এদের যে কোন এক গোষ্ঠীকে আঘাত করার উপর কম গুরুত্ব অর্পণ করলে সমগ্র শত্রু-গোষ্ঠীকেই বাঁচিয়ে রাখা হবে, যার অর্থ হবে বিপ্লবী শক্তির মৃত্যু বিপ্লবের পরাজয়।

শুধু এই তিন শত্রুই নয়, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদসহ এই তিন শত্রুত্রয়ের দেশী বিদেশী সকল সহযোগীরাও (তা তারা যে শ্রেণীরই হোক না কেন) পূর্ব বাংলার জনগণের শত্রু। এই প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলার এই শত্রুদের সহযোগী তাঁবেদার বাহিনী—মুসলীম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পি, ডি, পি ইত্যাদি গণবিরোধী ফ্যাসিষ্টদের বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত "রাজাকার বাহিনী" ও তথা কথিত "শান্তি কমিটি" (এরা কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণী নয়, তবে সামন্তবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত) যারা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সক্রিয় সহায়তায় ক্রমাগত গণহত্যা লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের নির্মূল করার প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের বিপ্লবী বাহিনীকে সর্বাধিক

গুরুত্ব অর্পণ করতে হবে। হানাদার পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনী অতর্কিতে পূর্ব বাংলার জনপদ আক্রমণ করে কিছুক্ষণ ধরে চালিয়ে যায় তাদের ধ্বংসলীলার কুকীর্তি। তাদের এই বর্বর সামরিক আক্রমণের হাত থেকে যারা অব্যাহতি পায় তাদেরকেও উক্ত রাজাকর বা শান্তিকমিটি নামধারী ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর ক্রমাগত নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হতে হয়। নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এরা নিজ এলাকারই জনগণকে ঠেলে দেয় তীব্র অত্যাচার নিপীড়নের মুখে। হানাদার দস্যু সেনাবাহিনী অপসারণের পরও এরা জনগণের উপর সে অত্যাচার সর্বক্ষণ চালিয়ে যায়, স্থানীয়ভাবে ক্রমাগত উত্তেজনা বজায় রাখে। শোষক শাসক শ্রেণীর অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে এরা জনগণকে সংগঠিত হতে দেয় না, বরং অত্যাচারী শোষকদের এরাই সংবাদ সরবরাহ করে, পথ দেখায়। জনগণের মনোবলকে উগ্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এরা ছিন্ন বিছিন্ন করে দেয়, বিপ্লবী জনশক্তিকে নির্মূল করতে এরা খুবই সচেষ্ট এবং সক্রিয়। এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল গণদুশমনরা পূর্ব বাংলার জনগণের ভয়ঙ্কর বিষাক্ত শত্রু এবং জনগণের শত্রু পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক সাম্রাজ্যবাদী শোষক ও সামন্তবাদী শোষক শ্রেণীর বিশ্বস্ত মিত্র। পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল ঘাঁটি হবে গ্রামাঞ্চল, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত স্থানীয় শত্রুদের বাঁচিয়ে রেখে সত্যিকারের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হবে না। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনগণের প্রাথমিক কর্তব্য হবে, পাকিস্তানী হানাদার শত্রু-সেনাদের আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্বে তাদের স্থানীয় সহযোগী মিত্রদের সমূলে খতম করা। মনে রাখতে স্থানীয় শত্রুদের বাঁচিয়ে রেখে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ পরিচালনা করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

পূর্ব বাংলার জনগণের এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুদ্ধ হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়, দীর্ঘ দিন ধরে শাসক ও শোষকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের উপর শোষণ-নিপীড়ন-অত্যাচার ও লাঞ্ছনার যে কলঙ্কময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মুক্তিপাগল জনগণের আজ এই অস্ত্রধারণ, গৌরব-উজ্জ্বল ইতিহাসের এক নব সূচনা। এই ঐতিহাসিক বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর এক আপোষ-হীন শ্রেণীদ্বন্দ্ব—পরস্পর হিংসাত্মক রক্তপাত যা দ্বারা লাঞ্ছিত শোষিত জনগণ উগ্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের শত্রু শোষক শ্রেণীকে সমূলে উৎখাত করে

অর্জন করবে নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা করবে জনগণের গণতন্ত্র শোষণহীন সুখী সমাজ ব্যবস্থা। নিঃসন্দেহে এটা হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম, এবং বর্তমান বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামেরই এক পর্যায়।

এই বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণকে সঠিক শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে দেশী-বিদেশী সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমূলে উৎখাত করে জনগণের সামগ্রিক বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন সঠিক পথে পরিচালিত একটি বিপ্লবী নেতৃত্বের। ঐতিহাসিকভাবে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই কৃষক-শ্রমিকের সুদৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে এই নেতৃত্ব দিতে পারে। অবশ্যই এই নেতৃত্ব হতে হবে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ মাও সে তুংএর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে, কৃষক শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বমূলক। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে থাকলেও এর মূল শক্তি হচ্ছে পূর্ব বাংলার ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক সমাজ। বুদ্ধিজীবি, কুটির শিল্পী মাঝারী কৃষক ও বিপ্লবী নারী সমাজ এই বিপ্লবের দৃঢ় মিত্র হিসাবে কাজ করবে। পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক (যারা কোনমতেই মুৎসুদ্দি নয়) ও ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এরা শ্রেণী হিসাবে শোসক এবং শোষিত উভয়ই। এরা কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী জনগণকে নির্মমভাবে শোষণ করে, আবার মুৎসুদ্দি একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণে নিজেরাও জর্জরিত। তাদের নিজস্ব পুঁজির বিকাশে সামন্তবাদ সহ এই দুই শোষক শ্রেণীই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। সে দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে তাদের একটা বড় অংশ আংশিকভাবে হলেও (জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে সক্রিয়ভাবে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সাময়িকভাবে বা নৈতিক ভাবে) বিপ্লবের সহযোগিতা করবে, কিন্তু নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এরা সামগ্রিক বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত না হলেও বর্তমান পর্যায়ে তাদের এই সহযোগিতা বিপ্লবী জনগণের গ্রহণ করা উচিত এবং নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভূমিকায় বর্তমান পর্যায়ে তাদের দোদুল্যমান মিত্র হিসাবে স্থান দেওয়া উচিত। কিন্তু বিপ্লবী জনগণকে অবশ্যই তাদের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তারা তাদের স্বার্থে প্রতিক্রিয়ার পুনর্জন্ম না দিতে পারে, শ্রেণী হিসাবে যা তারা করতে চেষ্টা চালাবে। যখনই

তেমন কোন পথ তারা গ্রহণ করবে ঠিক তখনই তাদের বিপ্লবী জনগণের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত তারা পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পথে আপোষহীন লড়াইতে অংশ গ্রহণ করবে ততদিন পর্যন্ত তাদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করার কোন অবকাশ নেই এবং তা করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। পূর্ব বাংলার প্রতিটি বিপ্লবীকে মনে রাখতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মধ্যবিত্তসুলভ অস্থিরতা, তাড়াহুড়া, একগুঁয়েমী, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অপরের বক্তব্যকে উপেক্ষা বা যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ এবং নানা প্রকারের দোদুল্যমানতার ফলে বিপ্লবে সমূহ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। সুতরাং প্রতিটি বিপ্লবীকে কঠোর বাস্তবতার ভিত্তিতে খুব ধীর স্থিরভাবে এই সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। সে দিকে দৃষ্টি রেখে জাতীয় ধনিকরা আগামী দিনে যাতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে তার জন্য এখন থেকেই জনগণের রাজনৈতিক চেতনার স্তরকে উন্নত করার জন্য বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এই রাজনৈতিক সচেতন জনগণকে আরো সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার সপক্ষে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা এবং যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে কিছু সংখ্যক দেশী-বিদেশী ব্যক্তি ও সংস্থা, বিদেশী কিছু রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থে পাকিস্থানী সামরিক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণীগতভাবে এদের অধিকাংশই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী, কিন্তু পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে স্বীয় স্বার্থ দ্বন্দ্বই তাদেরকে পূর্ব বাংলার জনগণের বিপ্লবী মিত্র শিবিরে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের একটি স্তর পর্যন্ত তারা মিত্র হিসাবে কাজ করে যাবে এবং পরবর্তী কালে এরাই বিপ্লবের বিরোধিতা করতে পারে এবং করবে। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বর্তমান মুহূর্তে বিপ্লবের এই সকল দোদুল্যমান মিত্রশক্তিকে যথাসম্ভব ব্যবহার করা উচিত। প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে, সে সুযোগকে পুরোপুরি ভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে সামগ্রিক ভাবে জনগণের বিপ্লবকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। অন্যতম বিপ্লবী রণকৌশল। কিন্তু

এই রণকৌশল প্রয়োগ করতে বিপ্লবী জনগণকে অবশ্যই যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে বিপ্লবের বর্তমান দোদুল্যমান মিত্ররূপী এসকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পরবর্তীকালে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। এখন থেকেই এই সমস্যার রাজনৈতিক মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুং-এর সঠিক চিন্তাধারায় আদর্শনিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিপ্লবী পার্টি, যা কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিপ্লবীকে অবশ্যই ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নের মাধ্যমে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মূল শিক্ষা—"জনগণের সেবা করার" মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তব বিপ্লবী জীবনে কঠোর আত্মত্যাগের মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে কমরেড স্তালিনের সতর্কবাণী—"বিপ্লবী অনুশীলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলে তত্ত্ব উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে"। এই মহান আত্মত্যাগের আদর্শে সুসজ্জিত হয়ে গ্রামের কৃষক শহরের শ্রমিক তথা পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণ এবং অন্যান্য মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদিগকে শ্রেণী সংগ্রামের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করে তাদের রাজনৈতিক চেতনার স্তরকে উন্নততর করে, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণযুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল করে, তাদের উপর নির্ভরশীল ও আস্থাবান হয়েই কেবল এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কমরেড মাও সেতুং বলেছেন—"বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জমসাধারণের যুদ্ধ, কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাঁদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।" সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে অবশ্যই বিপ্লবীদের জনগণের উপর আস্থা রাখতে হবে নির্ভরশীল হতে হবে, তাদের অফুরন্ত সৃজনী শক্তিকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে বিপ্লবী কর্মে নিয়োজিত করতে হবে, এককথায় সর্বকাজে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শত্রুদের নির্মূল করে জনগণের বিজয়কে সুসম্পন্ন করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই হচ্ছে সঠিক মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী পথ। পূর্ব বাংলার "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব" সুসম্পন্ন করতে, "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" প্রতিষ্ঠা করতে সকল প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর জনগণের শ্রেণীসংগ্রামকে চূড়ান্ত ভাবে সফল করে তুলতে কৃষক শ্রমিক সর্বহারা মেহনতী জনগণের পার্টি

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি সহ পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণীর দেশপ্রেমিক জনগণকে এই সঠিক পথেই এগিয়ে আসতে হবে। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধ একমাত্র এই পথেই বিজয় অর্জন করবে। এ ছাড়া পূর্ব বাংলার জনগণের সার্বিক মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে

আওয়ামী লীগ তথা পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত-ধনিক শ্রেণীর অহিংসা ও অসহযোগের গান্ধীবাদী নীতিকে পরিত্যাগ করে পূর্ব বাংলার জনগণ মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সাফল্যজনক ভাবে আজ তাঁদের জাতীয় মুক্তি ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। পূর্ব বাংলার জনগণের এ সাফল্যে ভীত সন্ত্রস্ত বিশ্ব প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পাকিস্তানের ফ্যাসিষ্ট সেনাবাহিনীকে জাহাজভর্তি অস্ত্র সাহায্যের মাধ্যমে আজ তারা পূর্ব বাংলায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করে চলেছে। চেয়ারম্যানের মহান চীন প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলায় এ ধরণের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলেন এবং পূর্ব বাংলার জনগণকেই তাঁদের নিজস্ব পথ বেছে নিতে সহায়তা করেন। পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণ তাঁদের নিজস্ব পার্টি মার্ক্স-বাদী-লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র এক দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের সঠিক পথে জনগণের বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হন। পূর্ব বাংলার এ সঠিক বিপ্লবী যুদ্ধে ভীত হয়ে দ্রুত ধ্বংসোন্মুখ ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী ফ্যাসীবাদ ও তাদের পদলেহী তাঁবেদার বাহিনী তাঁদের শেষ নিঃশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনগণ ও তাঁদের এ বিপ্লবী যুদ্ধকে ধ্বংস করার এক গণবিরোধী চক্রান্তে আজ তারা সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করে চলেছে। তাদের এ ঘৃণ্য ভূমিকা এটাই প্রমাণ করছে যে পূর্ব বাংলার জনগণ আজ মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী পূর্ব বালার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি সঠিক বিপ্লবী পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে আমাদের অতি অবশ্যই সশস্ত্রভাবে মোকাবেলা ও তাদের প্রতিটি হীন জঘন্য গণবিরোধী কার্যকলাপ আঘাতের মাধ্যমেই প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের সামনে রয়েছে কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, প্যালেষ্টাইন ও ল্যাটিন আমেরিকার সংগ্রামী জনগণের ঐতিহ্যময় ইতিহাস;

আমাদের সামনে রয়েছে ভারতীয় জনগণের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রক্তাক্ত ইতিহাস। মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ এবং মাও সেতুং-এর সঠিক চিন্তাধারাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে, তাঁদের মহান ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিপ্লবী পথ ধরেই আমরা আমাদের জাতীয় মুক্তির সশস্ত্র যুদ্ধ ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। জয় আমাদের হবেই। লাখো শহীদের রক্তে রাঙ্গানো স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বাস্তব সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই। পেন্টাগন বার্কিংহাম, ক্রেমলিন, নয়াদিল্লী বা ইসলামাবাদের সমগ্র মারণাস্ত্র দিয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী জনতার শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এ বিপ্লবী চেতনাকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হবে না বরং তাঁদের এ বহ্নিরোষে সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল কাগুজে-বাঘরাই নিশ্চিত ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আমরা জানি বিপ্লবী গণযুদ্ধে অস্ত্রই জয়পরাজয়ের একমাত্র নির্ধারক নয় বরং সঠিক আদর্শে পরিচালিত একটি বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র ও সুশৃঙ্খল জনশক্তিই দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে বিজয় লাভের একমাত্র গ্যারান্টি।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে আজ আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আত্মবলিদানে নির্ভয় হয়ে সমগ্র বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে বিজয় অর্জনে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা দীর্ঘজীবি হউক।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও
পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন

বিশ্বযুদ্ধদ্বয়ের আন্তর্জাতিক পরিণতি হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দখলীকৃত উপনিবেশগুলির জনগণের মাঝে এক মহান জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। রুশ জনতার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোতে হানে প্রচণ্ড আঘাত। এই বিপ্লবী অভিজ্ঞতা নিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির পদানত দেশগুলির সংগ্রামী জনগণ তাদের স্বীয় জাতীয় মুক্তির সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। এক এক করে উপনিবেশগুলি হাত-ছাড়া হয়ে যাবার ফলে বিশ্ব পুঁজিবাদ এক তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এক নূতন কৌশলের আশ্রয় নেয়—উপনিবেশগুলি থেকে প্রত্যক্ষ শাসন উঠিয়ে নিয়ে "স্বাধীনতার" নামে আপোষের পথে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মুৎসুদ্দি-ধনিক শ্রেণীর নিকট শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করে। মুৎসুদ্দি-পুঁজি কোন দেশের জাতীয় পুঁজি নয়—সাম্রাজ্যবাদ তথা বৈদেশিক পুঁজিবাদী দেশের লগ্নি পুঁজি। মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা ঋণের মাধ্যমে এই বিদেশী পুঁজি সংগ্রহ করে নিজ দেশে খাটায় এবং স্বদেশের জনগণকেই প্রচণ্ডভাবে শোষণ করে লভ্যাংশের প্রায় সম্পূর্ণটাই সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয় এবং পারিশ্রমিক হিসাবে নিজেরাও যৎসামান্য কিছু পেয়ে থাকে। এরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক ক্রীতদাস; এদের দ্বারা স্বনির্ভর জাতীয় পুঁজির বিকাশ ঘটতে পারে না। এরা স্বীয় স্বার্থরক্ষার খাতিরে সামগ্রিক ভাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকেই রক্ষা করে থাকে। সুতরাং তথাকথিত স্বাধীনতা প্রাপ্ত এ সকল অনুন্নত দেশের প্রত্যক্ষ শাসন ক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদ অবস্থান না করলেও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুৎসুদ্দি-ধনিক শ্রেণীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসন ক্ষমতায় এবং প্রত্যক্ষভাবে শোষণ ক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই উপবিষ্ট। সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ এ সকল দেশ স্বাধীনতার নামে সাম্রাজ্যবাদেরই নয়া উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ প্রথা বাতিল করে দিয়ে নয়া-ঔপনিবেশক শোষণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চরম সংকটে নিপতিত তাদের পুঁজিকে রক্ষা করার প্রয়াস পায় এবং পুঁজিবাদের এই মরণের যুগেও প্রভূত সাফল্যে চরিত্রগত ভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থরক্ষা করা'র দায়িত্ব বহন করে। ফলে তথাকথিত স্বাধীনতা

লাভের পরবর্তীকালে এই সকল দেশের জনগণ শোষণ-নিপীড়ন থেকে বিন্দুমাত্র নিষ্কৃতি পায়না, বরং নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ পদ্ধতিতে স্বদেশী ও বিদেশী আরো অধিক সংখ্যক শোষক দ্বারা আরো অধিক হারেই শোষিত নিপীড়িত হয়ে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এ সকল দেশের জনগণ কোনদিনই জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি, অর্জন করতে পারেনি সার্বভৌমত্ব, প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি জাতীয় সম্পদের উপর নিজস্ব অধিকার।

এ সকল নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণী (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) স্বীয় স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের স্বার্থ রক্ষা করতে জনগণের উপর পুঁজিবাদী কায়দায় চালাতে থাকে প্রচণ্ড শোষণ নিপীড়ন। একই সঙ্গে তারা নিজস্ব পুঁজি গড়ার দিকেও মনোযোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের দয়ার দান ক্রমাগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্বীয় পুঁজি দাঁড় করানো এক কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই দ্রুত পুঁজি গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তানী ক্ষমতাশালী মুৎসুদ্দি-পুঁজি-পতিরা (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) পুঁজিবাদী কায়দায় নিজদেশেরই জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি উৎপাদনশীল অংশ পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণীর জনগণের উপর চালাতে থাকে প্রচণ্ড এক ঔপনিবেশিক শোষণ। ইসলাম, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি, শক্তিশালী কেন্দ্র এবং শিশুরাষ্ট্রের নামে এই ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে তারা কেড়ে নিয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণের সকল মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মতাদর্শের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিল্প সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে অতি সুপরিকল্পিত ভাবে পূর্ব বাংলার শোষিত নিপীড়িত মেহনতী জনগণকে সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সচেতন হতে না দিয়ে নিশ্চিন্ত নির্বিবাদে চালাতে থাকে তাদের কুৎসিত ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন কার্য। এভাবে পূর্ব বাংলা সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত পাকিস্তানেরই একটি প্রত্যক্ষ উপনিবেশে পরিণত হয়।

সেই সঙ্গে কৃষিপ্রধান দেশ পূর্ব বাংলার কৃষক জনগণের (যারা শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) উপর চলতে থাকে প্রচণ্ড এক সামন্তবাদী শোষণ। পাকিস্তানী শাসক মুৎসুদ্দি-ধনিকদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের শাসন শোষণের

স্বার্থেই তারা সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার পরিবর্তে পূর্ব বাংলার সকল সামন্ত জমিদারদের (যাদের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু) সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে উৎখাত করে নিজেরাই অতি কদর্য চেহারায় সেই শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের বিলুপ্তি হলেও জোতদার, মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার, মজুতদার, ঠিকাদার, টাউট, বাটদার ও তাদের তাঁবেদার বাহিনীরূপী শতধা বিভক্ত সামন্ত শ্রেণী সম্মিলিত ভাবে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় (পুলিশ, মিলিটারী আইন, আদালত, চৌকিদার, দফাদার, ইউনিয়ন কাউন্সিল) ক্রমক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী শোষণের জগদ্দল পাথরকে সমাজের বুকে টিকিয়ে রেখেছে। এই সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত কৃষকদের হাতে তুলে দিতে হবে চাষের জমি—এরই নাম কৃষি বিপ্লব তথা জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব বাংলা আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবেই থেকে যাবে—যেখানে জনগণের উপর এই শোষণ অভিশাপের ন্যায় বিরাজ করতে থাকবে—জাতীয় মুক্তির বিপ্লব সামগ্রিক সাফল্য লাভে হবে ব্যর্থ।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনগণ এই শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে বার বার গর্জে উঠেছে, বিদ্রোহ করেছে। বিপ্লবী জনতা এই প্রতিক্রিয়াশীল শোষক গোষ্ঠীকে প্রতিহত করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বার বার গড়ে তুলেছে দুর্বার গণ-আন্দোলন, অপ্রতিরোধ্য গণসংগ্রাম। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ইসলাম, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও শক্তিশালী কেন্দ্র রক্ষার নামে সামন্তশোষক ও সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় সামরিক শাসনের বর্বর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ পরিচালনা করে পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনগণের উপর। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী আন্দোলন সঠিক নেতৃত্বের অভাবে হাবুডুবু খেতে থাকে, কিন্তু সাময়িক ভাবে কখনো কখনো স্তব্ধ হয়ে গেলেও সুযোগমত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে শোষক ও শাসক গোষ্ঠীকে আঘাত হানতে থাকে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত পূর্ব বাংলার সামাজিক জীবনে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের কারণেই এই বিপ্লবী জনগণকে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক পথে নেতৃত্ব দিতে কেউই এগিয়ে আসেনি। তথাকথিত রাজনৈতিক পার্টিগুলি ছিল বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত এবং স্বাভাবিক ভাবেই বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী। কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা জনগণের পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুংএর সঠিক চিন্তাধারার বাস্তব বিশ্লেষণে ও

প্রয়োগে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। জনগণের নেতৃত্ব দিতে অক্ষম প্রগতিশীল নামধারী এ সকল পার্টিগুলি সামগ্রিক জনগণের তেমন সমর্থনও লাভ করতে পারেনি। এদের মধ্যে নবগঠিত (১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে) পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুং-এর সঠিক চিন্তাধারাকে পূর্ব বাংলায় অনেকটা সৃজনশীল ও বাস্তবানুগ ভাবে প্রয়োগের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়। তাদের এ সঠিক ও বাস্তব কর্মপন্থাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে জনগণের সঙ্গে একাত্ম ও সম্পর্কিত হতে সহায়তা করে। কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মেহনতী জনগণের রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথে এগিয়ে আসে।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদী শোষণমুক্ত "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" প্রতিষ্ঠার গণমুক্তিযুদ্ধ চলছে, চলবে। পূর্ব বাংলার সামগ্রিক জনগণই এ গণযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা। ইতিহাসের আলোকে, ভবিষ্যৎ শ্রেণী-সংগ্রামে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন আছে, অবশ্য এ আলোচনা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করতে হবে।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে শোষণ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত পূর্ব বাংলার সামন্ত ও মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ তাদের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ৬ দফার মাধ্যমে আপোষের পথে তাদের শোষণের ক্ষমতা ও ক্ষেত্রকে পুনরুদ্ধারের এক প্রচেষ্টা চালায়। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণের নাগপাশ থেকে জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে জনগণ ক্রমেই সচেতন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এই বাস্তব উপলব্ধিকে আওয়ামী লীগই সর্বপ্রথম (১৯৬৬ সালে) অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। মুৎসুদ্দি-ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ তাদের শ্রেণীস্বার্থে কখনোই পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাতিল করে দেয়া হবে। ইয়াহিয়ার দেয়া এসকল অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী গণবিরোধী শর্ত-সমূহ মেনে নিয়ে ক্ষমতার লোভে এই নির্বাচনী প্রহসনে অংশগ্রহণ জনগণের সঙ্গে এক কলঙ্কময় বিশ্বাসঘাতকতা; গণতন্ত্রের নামে

গণতন্ত্রকেই হত্যা। নিজেদের এবং শ্রেণীমিত্র পাকিস্তানী শোষক-শাসকদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়েই আওয়ামী লীগ জনগণের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যার মূলে ছিল তাদের গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীচরিত্র। বিশ্বাসঘাতকের চেহারা এবং প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ঢাকতে গিয়েই আওয়ামী লীগ "জয় বাংলার" উগ্র জাতীয়তাবাদকে অবলম্বন করে এবং মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী জনগণের এক বিরাট অংশকে তাদের স্বপক্ষে টানতে সক্ষম হয়।

বামপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক জয়লাভের পরও ইয়াহিয়া যখন ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেয়, রাজনৈতিক সচেতন জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন সশস্ত্র সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসে, ২রা মার্চ থেকে বর্বর সেনাবাহিনীর বুলেট বেয়নেটে পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনগণ যখন রক্তাপ্লুত অবস্থায় পথে-প্রান্তরে লুটিয়ে পড়তে থাকে তখনো পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত-ধনিকশ্রেণীর নেতা আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিব সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করে "অহিংস অসহযোগের" ডাক দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী শাসক-শোষক-গোষ্ঠীর প্রকৃত শ্রেণীমিত্র হিসাবে পূর্ব বাংলায় তাদের রক্ষা করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়।

গত মার্চ মাসে আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে শেখ মুজিবের Agence France Press-এর রিপোর্টারের নিকট বক্তব্য

"Is the West Pakistan Government not aware that I am the only one able to save East Pakistan from Communism? If they take the decision to fight I shall be pushed out of power and Communists will intervene in my name. If I make too many concessions, I shall lose my authority. I am in a very difficult position"

(প্যারিসের Le-Monde পত্রিকায় ৩১শে মার্চ, '৭১ তারিখে প্রকাশিত) —এই উক্তি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্দি-শাসক ও শোসকশ্রেণী কখনোই আওয়ামী লীগের এই মিত্রতার যথার্থ মর্যাদা দেয়নি, বরং বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত শ্রেণীমিত্র হওয়া সত্বেও ছয় দফার আপোষের ফর্মুলাকে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে করতে থাকে এবং তাদের সঙ্গে অমিত্রসুলভ আচরণে লিপ্ত হয়। এই

ব্যাপারে উক্ত দুই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীমিত্রের মাঝে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব ছিল প্রকট। গত দুই যুগ ধরে প্রচণ্ডভাবে জনগণকে শোষণ করে পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্দি ধানক শ্রেণী (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) ক্ষুদ্র হলেও নিজস্ব পুঁজি গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং সে পুঁজিকে সম্পূর্ণ নিজস্ব উৎপাদন ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে জাতীয় পুঁজির বিকাশের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু মুৎসুদ্দি দাসদের স্বীয় পুঁজি বিকাশের পথে সাম্রাজ্যবাদী মহাপ্রভুরাই সবচাইতে বড় বাধা। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। গণচীন পাকিস্তান সরকারের এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে পাকিস্তানী মুৎসুদ্দি-ধনিক গোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব পুঁজি গড়ে তুলতে সহায়তা করতে থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণ স্বীয় স্বার্থের ভিত্তিতে আংশিকভাবে চীন-ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং প্রকাশ্যে চীনের সাহায্য সহায়তা কামনা করতে থাকে। তাছাড়া পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার বাজারে স্বীয় স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক পাকিস্তানী শাসক শোষক গোষ্ঠীর আজন্ম শত্রু ভারত সরকারকে নানাবিধ সাহায্য দান পাকিস্তান সরকারকে ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধান্বিত করে তোলে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়ে ওঠে। এই একই সময়ে চীনের ভারত-সরকার-বিরোধী ভূমিকা পাকিস্তান ও চীনকে আরো অন্তরঙ্গ করে তোলে।

অপরদিকে পূর্ব বাংলার মুৎসুদ্দি ধনিকদের নিজস্ব কোন পুঁজি ছিলনা, স্বীয় স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখতে তাদেরকে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরশীল থাকতে হতো। সে স্বার্থের কারণেই তারা বৃটেন-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের প্রতি অনুগত ও সহানুভূতিশীল এবং একই কারণে স্বাভাবিকভাবে রুশ-চীন-বিরোধী।

পাকিস্তানী ও পূর্ব বাংলার ধনিকরা একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের স্বার্থের বৈপরীত্যই শেষ পর্যন্ত আপোষের পথে চরম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানী ক্ষমতাশীন মুৎসুদ্দি গোষ্ঠী তাদের ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ব বাংলার মুৎসুদ্দি গোষ্ঠী তথা আওয়ামী লীগের ছয় দফার আপোষ ফর্মূলাকে নাকচ করে দিয়ে তাদের উপর পরিচালনা করে বর্বর আক্রমণ। পরবর্তীকালে এ আক্রমণ বিস্তার লাভ করে সমগ্র পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র

জনগণের উপর। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার সামন্ত-মুৎসুদ্দি শ্রেণী তথা আওয়ামী লীগের নেতিবাচক রাজনৈতিক ভূমিকার পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্রেণীমিত্র পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্দি-ধনিকদের সঙ্গে আপোষের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পূর্ব বাংলার এই সামন্ত-মুৎসুদ্দি শ্রেণী অর্থাৎ আওয়ামী লীগ আজ পূর্ব বাংলার জাতীয় ধনিক শ্রেণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। আজ তারা সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলে পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ, এমনকি জনযুদ্ধের বাত্তেল্লাও মারে। তাদের এ বর্ণচোরা ভূমিকা বহির্বিশ্বের জনগণ এমনকি পূর্ব বাংলার জনগণকেও নূতন করে বিভ্রান্তিতে নিপতিত করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্রই হচ্ছে জনগণকে বিভ্রান্ত করে স্বীয় শ্রেণীস্বার্থ আদায় করা। একথা স্মরণ রেখেই বিপ্লবী জনগণকে বুঝতে হবে আওয়ামী লীগের বর্তমান ভূমিকা তাদের আসল চেহারা নয়—চরম প্রতিক্রিয়াশীল, কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী ও সহায়তাকামী আওয়ামী লীগের গণবিরোধী ভূমিকা কোনক্রমেই জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা হতে পারেনা। নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে এরা জাতীয় বুর্জোয়াদের কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুকৌশলী এক অপচেষ্টায় লিপ্ত। পূর্ব বাংলার সামগ্রিক জনগণের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব স্বীয় কুক্ষিগত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়ায় এরা জনগণ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, জনগণের আস্থা হারিয়েছে, হারিয়েছে গণসংযোগ। এদের ভ্রান্ত নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীরা আজ দ্রুত তাদের এই বিভ্রান্তিকর মোহ থেকে মুক্ত হয়ে জনগণের সার্বিক মুক্তির কামনায় কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবী জনগণের মহান লাল পতাকা তুলে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে সঠিক নেতৃত্বে জনগণের বিজয়কে সুনিশ্চিত করছে। ফলে আওয়ামী লীগ আজ দেশী-বিদেশী রাষ্ট্র-সংস্থা ও ব্যক্তির মাধ্যমে "রাজনৈতিক সমাধানের" নামে আপোষের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এদের সম্পর্কে পূর্ব বাংলার জনগণের বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন; কেননা, যে কোন মুহূর্তে এদের আপোষমূলক বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব বাংলার জনজীবনে নূতন ধরণের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

এরা সুনির্দিষ্ট কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীভুক্ত নয়—তবে বেশিরভাগই সামন্তবাদী শোষণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এক ধর্ম (ইসলাম), এক জাতি

(পাকিস্তানী মুসলমান,) এক নেতা (জিন্না,) এক প্রতিষ্ঠান (ইসলামী প্রজাতন্ত্র) এবং এক রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ অবলম্বনকারী এই শ্রেণীকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় আফিংএর নেশায় মোহগ্রস্ত করে নিজেদের অন্ধ অনুগামী ও শোষণের সহকারী হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। চরিত্রগতভাবে এরা সম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রকার প্রগতি বিরোধী, কট্টর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, বাস্তবতার পরিপন্থী, কল্পনাবিলাসী, আবেগপ্রবণ, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন এবং বর্তমানেও সে চিন্তাধারাকে সমাজজীবনে প্রয়োগে আগ্রহী। এদের বেশীরভাগই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর অংশ বিশেষ, আবার কিছু অংশ রাষ্ট্রীয় সহায়তায় সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে হিন্দু জোতদার মহাজনদের সম্পত্তির দখলকারী। এক কথায় এরাই পূর্ব বাংলার শতধা বিভক্ত সামন্তবাদী শোষকশ্রেণীর বড় অংশ (উচ্চাকাঙ্খী, শিক্ষিত, অসাম্প্রদায়িক এবং বর্তমান পুঁজিবাদী বুর্জোয়া চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এদের অপর অংশ রাজনীতিগতভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত)। রাজনীতিগত-ভাবে এরা মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পি ডি পি) ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী পার্টি-গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। সামাজিক ভাবে এরা সামন্তবাদী শোষকের ভূমিকায় অবস্থান করে। সরকারী সহায়তায় (পুলিস, মিলিটারী, আইন, আদালত, ইউনিয়ন কাউন্সিল) জোতদারী, মহাজনী, তহশীলদারী, মজুতদারী, ঠিকাদারী, মাতব্বরী টাউটগিরি, বাটপাড়ী ইত্যাদি অমানুষিক সামন্তবাদী শোষণ কৃষক জনতার উপর এরাই চালিয়ে থাকে। এরা নিজেরা ব্যক্তিগত ভাবে পরিশ্রম-বিমুখ, ভোগবিলাসী, স্বার্থান্ধ এবং ক্রুর শোষণবুদ্ধিসম্পন্ন। অধীন ক্ষেতমজুর, কর্মচারী ও শ্রমিকদের এরা অমানুষিক দৈহিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করে, কিন্তু বিনিময়ে কখনোই উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়না—নির্মম ভাবে তাদের শোষণ করে থাকে।

নিজ এলাকায় এরা ভীষণ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী এবং সামাজিক মর্যাদা-সম্পন্ন। সমগ্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এদের রক্ষীবাহিনী হিসাবে কাজ করে। তাছাড়া তাদের হাতে রয়েছে দুটি শক্তিশালী প্রচার ব্যবস্থা (১) সরকারী প্রচার বিভাগ, বিভিন্ন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিসান, সিনেমা ইত্যাদি (২) ধর্ম প্রচারক নামধারী মৌলভি-মোল্লার দল। সামাজিক জীবনে ধর্মপ্রচার ও ধর্মীয় অনুশাসনের নামে—ওয়াজ মহফিল, মিলাদ, উরস ইত্যাদি বিভিন্ন

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এরা মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার কিংবদন্তী প্রচার করে, সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার অভিশপ্ত বিষবাষ্প ছড়িয়ে সমগ্র সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তোলে। জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক, গোত্রীয় এবং ব্যক্তিগত বিরোধ সৃষ্টি করে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর শোষণের পথকে সুগম ও নিশ্চিন্ত করা, শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিকে টিকিয়ে রাখা অর্থাৎ বর্তমান শোষণমূলক বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে প্রচলিত রাখাই এদের মূল উদ্দেশ্য। জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় এই শোষকদের ভূমিকা অতীব দুঃখজনক। সমাজ জীবনে এদের উপস্থিতি জাতীয় উৎপাদনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এরা সর্বদা জনগণকে সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার, ক্ষমতাসীন পাকিস্তানী সরকারের শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বর্তমানে এরাই "রাজাকর" ও "শান্তি কমিটি"র নামে হানাদার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করছে। সেনাবাহিনীর নির্দেশে এবং সহায়তায় এই ঘৃণ্য জীবরা নিজ এলাকায় জনগণকেই হত্যা করছে, লুট করছে তাদের সম্পত্তি—বসতবাটিতে করছে অগ্নিসংযোগ, নারীদের উপর চালাচ্ছে অকথ্য নির্যাতন। রাষ্ট্রশক্তির আশ্রিত ও নিয়ন্ত্রিত এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী অত্যাচারী শোষকশ্রেণী পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণীর দেশপ্রেমিক জনতার শত্রু। এদের এসকল ঘৃণ্য ভূমিকার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে খতম তথা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ভাবে সমাজ ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে এদের উচ্ছেদ। এদের বাঁচিয়ে রেখে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

পূর্ব বাংলার জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সংগঠন হল মাওলানা ভাসানী-পরিচালিত ন্যাপ, মস্কোপন্থী ন্যাপ, আতাউর রহমান পরিচালিত জাতীয় প্রগতি লীগ এবং কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (সেনাবাহিনী কর্তৃক ২৫ মার্চ রাত্রে তিনি নিহত হন) পরিচালিত "লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি"। পূর্ব বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই জাতীয় ধনিক ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালের ২৪শে নভেম্বর এবং ৪ঠা ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানী সুস্পষ্ট ভাষায় পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবী জানান। বলতে গেলে তিনিই পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি জনমত সৃষ্টি করেছেন।

সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বললেও এ ব্যাপারে তাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা বা প্রস্তুতি ছিল না। বস্তুতঃ '৬৮-'৬৯ সালের মত গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে—এরূপ ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতা মাওলানা ভাসানী পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের উপরই চাপিয়ে দেন। এর ফলে পাকিস্তানী ক্ষমতাশীল মুৎসুদ্দি শ্রেণীর সঙ্গে বাঙ্গালী মুৎসুদ্দিশ্রেণীর আপোষের প্রচেষ্টায় প্রচণ্ড এক বাধার সৃষ্টি হয়। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীরই নেতৃত্বে সম্পন্ন হবার কথা। কিন্তু বিশ্বব্যাপী পরিসরে এই বুর্জোয়া শ্রেণী তাদেরই শ্রেণী স্বার্থে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব থেকে সরে গেছে এবং ঐতিহাসিক ভাবেই এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি তথা কমিউনিষ্ট পার্টির উপর। এই স্বাভাবিক কারণেই পূর্ব বাংলার জাতীয় বুর্জোয়া পূর্ব বাংলার বর্তমান স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু বিপ্লবী শক্তি হিসাবে সশস্ত্র গণযুদ্ধে তাদের সক্রিয় উপস্থিতি ও ভূমিকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তানী শাসক ও শোষকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় তাদের ঔপনিবেশিক শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে কৃষক শ্রমিক-সর্বহারা-জনগণের পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টিকে প্রথম থেকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাদের শ্রেণী সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেবার এক ঘৃণ্যতম প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। ১৯৪৮ সালে গোপনে গড়ে ওঠা পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ব বাংলার বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণে এবং কর্তব্য নির্ধারণে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। জনগণকে শোষণ মুক্তির শ্রেণী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার, পরিচালনা করার পরিবর্তে তারাই জনতা দ্বারা বাহিত হতে থাকে এবং ঘটনার পেছনে লেজুড় বৃত্তিই তাদের প্রধান কর্ম হয়ে দেখা দেয়। ফলে ১৯৬৬ সালে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্টদের মাঝে বিভিন্ন মতাদর্শগত বিরোধ দেখা দেয় এবং পরবর্তীকালে তারা কয়েকটি পার্টি ও গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

(১) মস্কোপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (বর্তমান বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি)—রাজনীতিগতভাবে এ পার্টি সবচেয়ে দেউলে নীতির পরিচয় দেয়। শান্তিপূর্ণ সমাজতন্ত্র কায়েমের নামে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত এ পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সর্বদাই সশস্ত্র সংগ্রামের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। এরা ২৫শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব বাংলার

জাতীয় মুক্তির প্রশ্নকে, সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে 'হঠকারী' বলে অভিহিত করেছে। প্রথম থেকেই খোলাখুলিভাবে আওয়ামী লীগের অনাহুত লেজুড়বৃত্তি করাই ছিল এই পার্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ আওয়ামী লীগ ও দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী এই পার্টির মাধ্যে কোন পার্থক্যই ছিল না। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত এদের ভূমিকা আওয়ামী লীগেরই অনুরূপ।

(২) পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম· এল·) নামধারী তথা-কথিত এই বিপ্লবী পার্টি প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের আশীর্বাদপুষ্ট ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্দি-ধনিকদের চীন-ঘেঁষা নীতিকে প্রগতিবাদী বলে আখ্যায়িত করে পরোক্ষ-ভাবে পাকিস্তানী সরকারের নির্লজ্জ দালালীতে লিপ্ত হয়, পূর্ব বাংলার সামগ্রিক অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ না করে ভারতের বিপ্লবী রাজনীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও পূর্ব বাংলায় তা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পূর্ব বাংলার বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করে অবিভক্ত পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পাকিস্তানী প্রতি-ক্রিয়াশীল (এদের ভাষায় প্রগতিশীল)। ফ্যাসিষ্ট সেনাবাহিনীর নৃশংস গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং নারী নির্যাতনের মত ঘৃণ্যতম পাশবিক ও বর্বর কার্যাবলীকে নির্লজ্জভাবে সমর্থন করে এরা পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণেরই বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী নীতি থেকে এই বামপন্থী বিচ্যুতির জন্যই পূর্ব বাংলার জনগণ ঘৃণাভরে এদের পরিত্যাগ করেছে—ফলে জনগণের উপর তাদের রাজনৈতিক প্রভাবও দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে তা প্রায় নিঃশেষের পথে। এদের অধিকাংশ সদস্য ও কর্মীরা পার্টির গণবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করে এ পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক মার্কসবাদী বিপ্লবী নেতৃত্বে সমবেত হচ্ছে।

পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম· এল·)-র ভূমিকা দুঃখজনকভাবে গণবিরোধী। সমালোচনা এবং আত্ম সমালোচনার মাধ্যমে তাদের উচিত সঠিক পথ গ্রহণ করা।

(৩) কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি সামন্তবাদী

ৎপাদন ব্যবস্থাকে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রধান দ্বন্দ্ব মনে করলেও— ামন্ত শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী তারা গ্রহণ রতে পারেনি। পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পাকিস্তানী শোষণকে তারা বৃহৎ বিজাতীয় পুঁজির জাতিগত নিপীড়ন বলে মনে করে। তারা আরো মনে করে এই বৃহৎ বিজাতীয় পুঁজি ঘটনাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছে। তাদের বিশ্লেষণ অনুসারে পাকিস্তানী এই পুঁজির বিরুদ্ধে ংগ্রাম করা যেতে পারে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার কোন প্রশ্ন আসতে ারে না। অথচ বর্তমানে তারা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছে। তারা নে করে বিপ্লবের পূর্বে পার্টি গঠনের কোন আবশ্যকীয় প্রয়োজন নেই। বপ্লবের পরে বিপ্লবীদের সমন্বয় করে পার্টি গঠিত হবে। এ বক্তব্য ার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সে তুং চিন্তাধারার বিরোধী অথচ তারা নিজেদের মার্কসবাদী লেনিনবাদী ও মাও সে তুংএর চিন্তাধারার অনুসারী বলে দাবী করে। আবার ইতিমধ্যেই তারা তাদের সমন্বয় কমিটিকেই "পার্টি" বলে দাবী করতে শুরু করেছে। তাদের কাজ এবং কথায় কোন মিল নেই। অপর দিকে (৪) পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন নামধারী অপর বামপন্থী দলটি শুধুমাত্র পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষপাতী, কিন্তু সমাজ-জীবনে জগদ্দল পাথরের মত অবস্থিত কৃষক জনতার দুঃখকষ্টের মূল সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে তাদের কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য বা কর্মসূচী নেই। ফলে বাস্তবে এই সংগঠনদ্বয় এক একটি "সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে" পরিণত হয়েছে যারা নিঃসন্দেহে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিতে নিপতিত। এরা এটা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, পূর্ব বাংলার জনগণের শোষক ও শত্রু পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদ—এই তিন গোষ্ঠী পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ রক্ষাকারী শ্রেণীমিত্র এবং অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এদের যে কোন একটিকে উৎখাত করার দিকে কম গুরুত্ব দিলে সমুদয় শোষকশ্রেণীকেই বাঁচিয়ে রাখা হবে যার অর্থ হবে সমাজ জীবনে শোষণের অবস্থান, জনগণের দুঃখদুর্দশার উপস্থিতি অর্থাৎ সামগ্রিক-ভাবে বিপ্লবের পরাজয়। যাই হোক, এরা বর্তমানে সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র ভাবেই লড়াই করে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এই বিপ্লবী শক্তি সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে দীর্ঘ ও সশ

গণযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করবে পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা করবে জনগণের গণতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা।

(৫) পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি—১৯৬৮ সালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুংএর সঠিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা এই পার্টির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং বৈপ্লবিক মৌলিকত্ব হচ্ছে যে, এরা একই সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং জনগণের গণতান্ত্রিক মুক্তির প্রশ্নে আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদকে সমূলে উৎখাত করে "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" প্রতিষ্ঠার একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচী জনগণের সম্মুখে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। ফলে তারা দ্রুত কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বহারা মেহনতী জনতা ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে থাকে। কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরেও পাকিস্তানী শোষণের চরিত্র, বিপ্লবের মূল দ্বন্দ্ব, চরিত্র, সঠিক পথ ও রণনীতি রণকৌশল-নির্ধারণে ছিল নানা দোদুল্যমানতা। অনেকে জাতীয় মুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পণ করে, আবার অনেকে জাতীয় মুক্তির প্রশ্নকে বাদ দিয়ে বা ছোট করে দেখে শুধুমাত্র জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রাধান্য দিতে থাকে। ফলে পার্টির অভ্যন্তরেই ডান ও বামপন্থী বিচ্যুতি বিরাজ করতে থাকে। তবে বেশীর ভাগ পার্টি-কর্মীই সঠিকভাবে পূর্ব বাংলার সামগ্রিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণে সমর্থ হয় এবং একই সঙ্গে জাতীয় মুক্তির এবং জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নে ঐকামত পোষণ করে—অন্যান্য সকল কর্মীরাও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে তা মেনে নেয়।

বর্তমানে এ পার্টি পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় মুক্তি অর্জন ও জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র গণযুদ্ধের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা ও সঠিক রাজনৈতিক কর্মসূচীর যথার্থ প্রয়োগের ফলে পার্টি বর্তমানে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে, জনগণের আস্থা লাভ করছে এবং তাদের সঙ্গে আরো নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে। এই পার্টি জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সশস্ত্র গণযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে, আহ্বান জানিয়েছে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী সকল জনগণ ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন, গণসংগঠন ও ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিপ্লবী ঐক্য-ফ্রন্ট গঠন করতে। পূর্ব বাংলার বর্তমান জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পূর্ব

বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, এবং দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে অবশ্যই সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সুতরাং বর্তমান ঐক্য-ফ্রন্ট বিভিন্ন মতাদর্শের বিপ্লবী জনগণের ঐক্যের সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করবে—ত্বরান্বিত করবে বিপ্লবের কাজ। মাকর্সবাদী লেলিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সশস্ত্র হানাদার শত্রুদের সশস্ত্র ভাবেই মোকাবিলা করে চলেছে। পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুং এর সঠিক চিন্তাধারাকে বাস্তব ও সৃজনশীল ভাবে প্রয়োগ করে চলেছে। এদের বিপ্লবী নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জনগণের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ববাংলার সর্বশ্রেণীর বিপ্লবী জনগণ বিশেষতঃ কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগ্রামের এক সুমহান ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যার ফলে পরবর্তীকালে বাঙালী ধনিক শ্রেণী সহ পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, ই পি আর আনসার ও মোজাহেদ বাহিনী এক বিরাট প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং সক্রিয়ভাবে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মৌলিক। তাদের আকাঙ্ক্ষা যেমন সৎ তেমনি তার জন্য তাদের ত্যাগও অপরিসীম। তারাই বেশী মৃত্যুবরণ করেছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে তারাই সর্বাধিক, ৮০ লক্ষের মত কপর্দকহীন শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে—ভারত ও ব্রহ্মদেশে। পাহাড় জঙ্গল ডিঙ্গাতে গিয়ে অসংখ্য মৃত্যুবরণ করেছে। অসংখ্য মা-বোন হয়েছে লুণ্ঠিতা ও লাঞ্ছিতা। উগ্র জাতীয়তাবাদের আগুনে পুড়ে মরল কয়েক লক্ষ জনতা।

এই পরিস্থিতিতে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী ছাত্র-কৃষক ও জনতার সহায়তায় জীবনপণ করে শত্রুর মোকাবেলা করেছে—স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা, কলকারখানা অচল করে দিয়েছে, স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছে পাকিস্তানী ডাক তার ও বেতার। পূর্ব বাংলার বাঙালী আমলা এবং ধনিকশ্রেণীও আওয়ামী লীগের অথর্ব নেতৃত্বের মোহকে ঝেড়ে ফেলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণে এগিয়ে এসেছে।

এককথায় পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর দেশপ্রেমিক জনগণ অহিংস অসহযোগের গান্ধীবাদী নীতিকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে একযোগে সশস্ত্র শত্রুকে সশস্ত্র ভাবেই মোকাবেলা করতে এগিয়ে এসেছে। হানাদার পাকিস্তানী শত্রুসেনার উপর এমন আঘাত তারা হেনেছিল যে, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞ ও সুশৃংখল শত্রুও প্রথম দিকে ঢাকা ও কুমিল্লা ছাড়া সবগুলি শহরে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। এই সময় শহর ও গ্রামের শ্রমিক কৃষক ছাত্র জনতার হাতে যদি অস্ত্র তুলে দেয়া হত (সে অস্ত্রের গুদাম ও ব্যারাক তখন আমলা অফিসার ও আওয়ামী লীগের কর্তৃত্বে ছিল), যদি তাদের মুক্তিযুদ্ধে সামিল হবার আহ্বান দেয়া হত তাহলে পূর্ব বাংলার সংগ্রাম তখনই সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের রূপ নিত। শত্রুসেনার পক্ষে এত দ্রুত সবগুলো শহর দখল করাতো দূরের কথা নিজদের অস্তিত্ব বাঁচানোই কষ্টকর হয়ে পড়তো। তা হলে অন্যভাবে লিখিত হত পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ইতিহাস। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল বাঙ্গালী মুৎসুদ্দি ধনিকশ্রেণী তথা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দ্বারা মেহনতী জনগণের হাতে অস্ত্রপ্রদান এক অসম্ভব কল্পনা এবং তাদের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধের সূচনার কথা চিন্তা করাও নির্বুদ্ধিতা মাত্র। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ স্বাধীনতার তীব্র কামনা নিয়ে, অযোগ্য অথর্ব গণবিরোধী নেতৃত্বের পেছনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে, সশস্ত্র সংগ্রামের কোন প্রস্তুতি না নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সশস্ত্র শত্রুকে ঘায়েল করতে গিয়ে বিপ্লবী জনতা বিশেষ করে শহরের শ্রমিক শ্রেণী নিজেরাই ঘায়েল হয়ে গেছে; নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে গ্রামে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। জীবনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা দিয়ে আজ তারা বুঝতে শিখেছে, এ যুদ্ধ হচ্ছে শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে শোষক ও শোষিতশ্রেণীর এক আপোষহীন দ্বন্দ্ব—পরস্পর হিংসাত্মক রক্তপাত। এ যুদ্ধ হচ্ছে মুক্তির যুদ্ধ—বিপ্লবী যুদ্ধ, যা দ্বারা পূর্ব বাংলার শোষিত নিপীড়িত জনগণ উগ্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অর্জন করবে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা করবে জনগণের গণতন্ত্র, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা; এটাই হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম, এবং বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামেরই এক পর্যায়—শ্রেণী সংঘর্ষ। বাস্তবতার নির্মম কষাঘাতে আজ তারা বুঝতে পারছে নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তৃতায় বা শ্লোগানে কখনোই জাতীয় মুক্তি আসতে পারে না; মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসম্প্রদায় বুর্জোয়া বা পাঁতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না; রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায় না লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র অসংগঠিত অথচ নিবেদিত-

প্রাণ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। সেই সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের আরো শিখিয়েছে, পরনির্ভরশীল হয়ে বিশেষতঃ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও তার পদলেহী অনুচরদের উপর নির্ভর করে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। নিজের জাতি ও দেশের জনগণের মুক্তির যুদ্ধে নিজ দেশেরই জনগণকে ব্যাপকহারে সংগঠিত ও ঐকাবদ্ধ করে নিজস্ব গণবাহিনী গড়ে তুলে সশস্ত্র গেরিলা পদ্ধতিতেই এ দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব। ব্যাপক জনগণকে রাজনৈতিক সচেতন. ঐকাবদ্ধ, সংগঠিত এবং সশস্ত্র না করতে পারলে অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী এ গণযুদ্ধে জনগণকে সমবেত না করতে পারলে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

পূর্ব বাংলার বর্তমান সংগ্রাম ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণ করেছে, পূর্ব-বাংলার জনগণের বাস্তব-অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তাধারা, রণকৌশল ও কর্মপদ্ধতি তাদের নেতৃত্বের তুলনায় ছিল অনেক উন্নততর এবং অগ্রসরমান। সর্বদাই জনতা ছিল সংগ্রামের পুরোভাগে, নেতৃত্ব ছিল পিছনে পড়ে। "কোনকালে ব্যাপক জনতা ভুল করে না"—পূর্ব বাংলার জনগণ এই মার্কসীয় মূলনীতি অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে, কোন কোন সময়ে সাময়িকভাবে বিপথগামী হলে তা হয়েছে ভ্রান্ত ও খোঁড়া নেতৃত্বের জন্যই।

বিপ্লব কখনো চূড়ান্ত বিজয়লাভে সক্ষম হয় না যদি না তার নেতৃত্বে থাকে একটি সচেতন ও সুসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি—যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুং-এর সঠিক চিন্তাধারার সৃজনশীল অনুসারী, যা ব্যাপক কৃষক সমাজকে রাজনীতিগতভাবে সচেতন করে কৃষক ও শ্রমিক-শ্রেণীকে দৃঢ় মৈত্রীর বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম এবং যা দেশী-বিদেশী সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে একটি সুশিক্ষিত সুশৃংখল ও রাজনৈতিক সচেতন জনগণের সশস্ত্র গণবাহিনী পরিচালনা করতে সক্ষম। পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি এ মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র জনতাকে রাজনীতিগতভাবে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই তারা এই বিপ্লবী জনগণকে বহুলাংশে রাজনৈতিক ভাবে মৈত্রীর বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করেছে সমবেত করেছে তাদের সুমহান লাল পতাকার তলে, সুসজ্জিত করেছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারায়; গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে জনগণের সশস্ত্র গণবাহিনী এবং তাদের পরিচালনা করছে পূর্ব

বাংলার জনগণের ঘৃণ্যতম শত্রু পাকিস্তান উপনিবেশবাদ, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদ এই তিন প্রতিক্রিয়াশীল শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গণযুদ্ধে, সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন পূর্ব বাংলা। এই বিপ্লবী শক্তির জয় অবধারিত।

শোষণ মুক্তির সংগ্রামে পূর্ব বাংলা
ও
পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনের নাগপাশ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ আজ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সমগ্র আপোষ আলোচনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে পূর্ব বাংলার বুকে এক সশস্ত্র গণ মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছে। পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী সামন্তধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ তাদের শ্রেণীস্বার্থের কারণেই অহিংস আন্দোলনের পথে পূর্ব বাংলার জনগণকে প্রথম থেকেই সুকৌশলে নিরস্ত্র রাখার ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, যদিও তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের শোষক শাসক গোষ্ঠীর শোষণের ক্ষেত্র বন্টনের বখরা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। নিরস্ত্র জনগণকে শত্রুর অত্যাচার নিপীড়নের মুখে ঠেলে দিয়ে আপোষের মাধ্যমে স্বীয় শ্রেণী-স্বার্থ আদায় করার জঘন্য চক্রান্তের কারণে আজ পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মেহনতী জনগণকে অকাতরে প্রাণবলি দিতে হচ্ছে, শরণার্থী হিসাবে ভিটা-মাটি ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে হচ্ছে, সীমাহীন অসুবিধা ও সংকটে দিন কাটাতে হচ্ছে। এক কথায় পূর্ব বাংলার সামন্ত ও ধনিক শ্রেণী তথা আওয়ামী লীগের হঠকারিতায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পূর্ব বাংলার জন জীবনে এক চরম বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টির প্রথম থেকেই সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে যে সকল শোষক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব প্রাধান্য লাভ করেছিল তাদের মধ্যে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ শাসনের দ্বন্দ্ব ছিল অন্যতম; তাছাড়া অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদী শোষণ ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সঙ্গে। পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রাম এই তিন শোষক শত্রু শ্রেণীরই বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং এই তিন শোষণের বেড়াজাল থেকে মুক্তির এক দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গণযুদ্ধের সূচনা মাত্র।

উনিশশ সাতচল্লিশ সালে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের চক্রান্তে স্বাধীনতার নামে আপোষে পাক-ভারতের ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর নিকট পাক ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ বিন্দুমাত্র কমেনি,

বরং তাদের এ নয়া ঔপনিবেশিক শোষণে উভয় দেশই অদ্যবধি জর্জরিত। সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে পড়ে পাকিস্তান উনিশশ সত্তর সালের জুলাই মাস পর্যন্ত মোট পঁয়তিরিশ শত কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে প্রতিবছর এই পর্বত প্রমাণ ঋণ ও তার সুদ হিসাবে নয়া ঔপনিবেশিক কায়দায় মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ২২.৫ ভাগ সাম্রাজ্যবাদীদের কুক্ষিগত হচ্ছে। উনশিশ সত্তর সালের জুলাই মাসে দেউলিয়া পাকিস্তান সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ দাবী করলে পাকিস্তানে ঘনীভূত আর্থিক সঙ্কট (saturated point of Economic debt servicing charge, অর্থাৎ যখন কোন দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা পঁচিশ ভাগ ঋণ ও সুদ হিসাবে দেয়া হয়) সৃষ্টির আশঙ্কায় বিশ্বব্যাঙ্ক তা প্রত্যাখ্যান করে। বাস্তবপক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণে বহুপূর্ব থেকেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল এবং ক্রমশই তা তীব্রতর হচ্ছিল, উনিশশ সত্তর সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানকে ঋণদানে বিশ্বব্যাঙ্কের অসম্মতিই তার জলন্ত প্রমাণ। ফলে পাকিস্তানী বণিক শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার ধনিকশ্রেণী সহ সমগ্র পাকিস্তানের জনগণকে অস্বাভাবিক হারে শোষণ করতে থাকে। যার পরিণতি পাকিস্তানী শাসক ধনিক ও পূর্ব বাংলার ধনিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলেছে এবং মুক্তিকামী জনগণের বিপ্লবী ভূমিকার ফলে বর্তমানে তা সশস্ত্র রূপ লাভ করেছে, পূর্ব বাংলার ধনিকশ্রেণীর যা কখনোই কাম্য ছিল না।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দু সামন্ত শ্রেণীকে এবং সেই একই সঙ্গে কৃষককে তাদের জমি সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গত চব্বিশ বৎসর ধরে জোতদার মহাজন শ্রেণী পূর্ব বাংলার জনগণের উপর চালিয়ে আসছে প্রচণ্ড এক সামন্তবাদী শোষণ। জোতদার মহাজন ইজারাদার তহশীলদার মজুতদার ঠিকাদার, ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ও চেয়ারম্যান ও তাদের দালাল বাহিনীরূপী ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের এই অপভ্রংশ শ্রেণীই রাষ্ট্রীয় সহায়তায় (পুলিশ, মিলিটারী, আইন, আদালত, চৌকিদার দফাদার, ইউনিয়ন কাউন্সিল ইত্যাদি) চিরাচরিত সামন্তবাদী প্রথায় পূর্ব বাংলার কৃষক জনতার উপর চালিয়ে যাচ্ছে অকথ্য দুঃখময় শোষণ নিপীড়ন। ফলে পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজ দ্রুত তাদের চাষের জমি হারিয়ে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, বর্গা ও গরীব চাষীতে, এককথায় সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীতে

পরিণত হয়েছে। কৃষি প্রধান দেশ পূর্ব বাংলার জনগণের বিরাট অংশ (শতকরা ৭৫ জন) কৃষক সমাজের দুঃখ কষ্টের মূল এই সামন্তবাদী শোষণমূলক উৎপাদন ব্যবস্থা যা যৌথ ভাবে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষকশ্রেণী ও পূর্ব বাংলার আভ্যন্তরীণ সামন্তশ্রেণী তথা জোতদার মহাজনদের দ্বারা পরিচালিত। গত চাব্বিশ বৎসরে

(ক) পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সরকার পরিচালিত ক্রমবর্ধমান সামন্তবাদী শোষণের পরিমাণ

(১) ইজারাদারী, তহশীলদারী, আমিনদারীর (জমির পরিমাপক) মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ১½ কোটি, ১৯৭০ সালে ১৮ কোটি টাকা;

(২) ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল, বিভাগীয় কাউন্সিল, শহরের পৌরসভা, সমবায় সমিতি, কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ, তন্তুবায় ঋণ, ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি সরকারী শোষণ যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন কর ও সুদ ধার্য্যের পরিমাণ ১৯৪৭ সাল ৩০ লক্ষ টাকা, ১৯৭০ সাল ১২½ কোটি টাকা;

এ ছাড়া এ সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সকল আমলা অফিসাররা ঘুষ বাবদ কৃষক জনতার নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ ছিনিয়ে নেয় তার পরিমাণও ৩ থেকে ৪ কোটি টাকার কম নয় (পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশিত রিপোর্ট "বর্তমান অবস্থায় বিপ্লবীদের করণীয়" থেকে গৃহিত)।

(খ) দেশীয় সামন্ত শ্রেণীর গত চব্বিশ বৎসর ধরে একটানা জোতদারী, মহাজনী, মজুতদারী, ঠিকাদারী, চোরাকারবারী, হাটের তোলা, ঘাটের তোলা, নদীর তোলা, ডিগ্রী জারী ক্রোকে-নিলাম ও জবর দখল ইত্যাদি ধরনে প্রভৃতি শোষণের ফলে বর্তমানে বাংলার কৃষকসম্প্রদায়ের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা নিম্নরূপ :—

পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজ	১৯৪৭ সাল	১৯৭০ সাল
ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা	১৫—২০%	৪০—৪৫%
বর্গাচাষী	২৫—৩০%	৩৫—৪০%
গরীব কৃষক	২৫—৩০%	১০—১৫%
মাঝারী কৃষক	১০—১৫%	৭—১০%
ধনী কৃষক ও জোতদার	৫—১০%	১০—২০%

সুদীর্ঘ দিন ধরে পূর্ব বাংলার কৃষক জনতা সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থায়

যে কি তীব্র হারে শোষিত বঞ্চিত হয়েছে তা উপরে বর্ণিত কৃষক সমাজের অবস্থার পরিবর্তনই সুস্পষ্ট নির্দেশক। স্বল্প ও মোটামুটি পরিমাণ জমির মালিক গরীব ও মাঝারী কৃষক সম্প্রদায় এই অভিশপ্ত শোষণের যাঁতাকলে তাদের চাষের জমি হারিয়ে বর্গাচাষী ও ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। অপরদিকে সুকৌশলী সামন্তবাদী প্রথায় এই দুস্থ কৃষকদিগকে উচ্ছেদ করে তাদের জমি সম্পত্তি গ্রাস করেছে মেহনতী কৃষক জনতার ঘৃণ্য শত্রু জোতদার মহাজন শ্রেণী। কৃষকদের জমি অন্যায় ভাবে দখল করে তারা ফুলে ফেঁপে উঠেছে দিন দিন, বর্তমান শোষণ ব্যবস্থায় বিকশিত হচ্ছে তারা। পূর্ব বাংলার দুই তৃতীয়াংশ জমিই বর্তমানে এই অকৃষকদের হাতে চলে গেছে। পূর্ব বাংলার কৃষকদের হাতে চাষের জমি নেই অথচ, রামগতির ইসমাইল সর্দারের দখলে আছে ২০ হাজার বিঘা জমি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম. এল.)-এর নেতা নোয়াখালীর মোহাম্মদ তোহা সাহেবদের হাজী পরিবারের দখলে রয়েছে, ৩০ হাজার বিঘা; বরিশালের সুব্রত মাড়ুয়ার রয়েছে ১৫ হাজার বিঘা, নীলমণি হালদারের রয়েছে ১২ হাজার বিঘা, ফরিদপুরের মোহন মিঞার আছে ৪৫ হাজার বিঘা এবং তার ভাই লাল মিঞার রয়েছে ৫৫ হাজার বিঘা (পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নোয়াখালীর কমরেড আবুল বাসার এবং নোয়াখালী জেলা কমিটির কমরেড নূরুল হক চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত এই রিপোর্ট, যথাক্রমে তাঁদের লেখা "ছয় দফা বনাম পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন" ও "ভোট বর্জন কেন?" বই দুটিতে প্রকাশিত)। এমন আরো শত শত জোতদার মহাজন অন্যায় ভাবে বলপূর্বক দখল করে রেখেছে সহস্র সহস্র বিঘা জমি আর চরম নিপীড়নের দ্বারা বঞ্চিত করে রেখেছে পূর্ব বাংলার কয়েক কোটি কৃষক জনতাকে। শুধু তাই নয়, এই সর্বহারা ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের তারা এই সকল জমিতে প্রায় ভূমিদাস হিসাবেই বিনিয়োগ করে এবং অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করে, কিন্তু বিনিময়ে তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক কখনোই দেয়না। এই প্রচণ্ড শোষণের ফলে জমি থেকে বিতাড়িত এই ক্রমবর্ধমান সর্বহারা শ্রেণী শুধুমাত্র ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের তাড়নায়, গ্রাম ছেড়ে রিক্তহস্তে শহর ও শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে. রেল ষ্টেশনে, ষ্টিমার ঘাটে, ডকে, বন্দরে ও বাজারে কায়িক শ্রমযোগ্য কাজের ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিল্পে অনুন্নত পূর্ব বাংলা ক্রমবর্ধমান এই বিশাল

সর্বহারা শ্রেণীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেনা। ফলে এই লক্ষ লক্ষ সর্বহারা বেকার শ্রেণীর ক্ষুধার অন্ন জোটেনা, লজ্জা ঢাকার বস্ত্র জোটেনা, রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় বাদলে জোটেনা তাদের কোন আশ্রয়। অনাহারে অর্ধাহারে প্রতিনিয়ত এরা শয়ে শয়ে ঢলে পড়ছে মৃত্যুর গহীন কোলে ; এই শোষণমূলক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুর নির্মম নিষ্পেষণের যাতনাময় অজস্র মৃত্যুর হাত থেকে লাভ করে এক মহামুক্তি। ঔপনিবেশিক আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে এরই নাম স্বাধীনতা! এরই নাম গণতন্ত্র! এরই নাম বিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী সমাজের মানব সভ্যতা! বিশ্বব্যাপী পরিসরে মানব জাতির এই কলঙ্কময় বিপর্যয়ের মূল কারণ শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার যতদিন না অবসান ঘটবে, মানব সভ্যতা ততদিন বইয়ের তত্ত্বকথাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, বাস্তব জীবনে কার্যকরী হবেনা কখনো।

অপরদিকে সুক্ষ্ম দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে দেখা যাবে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষকরা শুধুমাত্র পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণকে শোষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং একই সঙ্গে তহশীলদারী প্রথার মাধ্যমে তারা শোষণ করেছে পূর্ব বাংলার জোতদার-মহাজন শ্রেণীকে (কারণ জমির মালিক হচ্ছে তারাই)। ফলে পূর্ব বাংলার সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে পাকিস্তানী শোষক শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিরাজ করতে থাকে এবং তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির উপর রুষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ববাংলার উঠতি বুর্জোয়া গোষ্ঠী এই একই স্বার্থের কারণে শ্রেণীমিত্র হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। পূর্ব বাংলার এই দুই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শ্রেণী অতঃপর পরস্পরের স্বার্থ রক্ষার চুক্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের শ্রেণী সংগঠন আওয়ামী লীগে সমবেত হয়ে ৬ দফার এক আপোষ আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক গোষ্ঠীর সঙ্গে শোষণের ক্ষমতা ও ক্ষেত্রবন্টন নিয়ে দরকষাকষিতে লিপ্ত হয়। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুব ঘোষণার মাধ্যমে তহশীলদারী প্রথা সীমিতকরণের প্রস্তাব চুক্তি অনুযায়ী সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষারই এক সুকৌশলী প্রচেষ্টা মাত্র, কেননা পূর্ব বাংলার দুই তৃতীয়াংশ জমির মালিক হচ্ছে জোতদার মহাজনশ্রেণী এবং অধিকাংশ কৃষকেরই কোন জমি নেই। সুতরাং খাজনা মওকুবের মাধ্যমে

কৃষকদের নয়, সামন্ত-মহাজন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল আওয়ামী লীগের ক্রুর উদ্দেশ্য। কৃষক জনতাকে সামন্তবাদী শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার কোন পরিকল্পনা তারা কখনোই গ্রহণ করেনি, শ্রেণীগত চরিত্রের কারণেই এই সামন্ত ধনিক শ্রেণী তা করতে পারেনা। পূর্ব বাংলার জনগণকেই নিরলস ভাবে তাদের এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সামন্তবাদী শোষক শত্রুর বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী নয়া উপনিবেশবাদীরাও এই শোষকের ভূমিকায় অবস্থান করছে। সুতরাং জনগণের সার্বিক মুক্তির জন্য জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য, শোষণমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য, পূর্ব বাংলার বীর বিপ্লবী জনগণ আজ এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছে। বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমেই এই গণ শত্রুদের সমূলে উচ্ছেদ করে, বিধ্বস্ত করে, নিশ্চিহ্ন করে দৃঢ় পদভারে এগিয়ে যাচ্ছে গণযুদ্ধের বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। জয় তাদের অবধারিত।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণের রূপ

পূর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষক গোষ্ঠী যে হারে শোষণ করে আসছে তা জানতে হলে পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয় ও ব্যয় অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ততম করে বলতে গেলে শিল্পে অনুন্নত আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের বেশির ভাগ সম্পদই কৃষিজাত যা মূলতঃ পূর্ব বাংলারই সম্পদ। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববাংলার বিদেশে রপ্তানীযোগ্য দ্রবাদি ও পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ—

	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
রপ্তানি যোগ্য দ্রব্যাদি	পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি, চামড়া, চা, সূতি বস্ত্র, চিনি, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, সার, ও মৎস্যজাত খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি।	তুলা, চামড়া, সূতি ও পশমী বস্ত্র, রেয়ন খেলাধুলার সামগ্রী, চিনামাটির তৈজসপত্র ও ফল ফলাদি।
মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ	শতকরা ৭৩ ভাগ	শতকরা ২৭ ভাগ

অন্যদিকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে পাকিস্তানী শাসক ও শোষক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে চরমভাবে বঞ্চিত করে বিগত দুই যুগ ধরে চালিয়ে গেছে এক অকথ্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ। মোটামুটিভাবে সংক্ষিপ্ততম করে পাকিস্তানের বাৎসরিক বাজেট আলোচনা করলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

মোট বাজেট	শতকরা বরাদ্দকৃত অংশ	পশ্চিম পাকিস্তান	শতকরা অংশ	পূর্ব বাংলা	শতকরা অংশ
১। সামরিক খাতে	৬৫%	সেনাবাহিনীর শতকরা ৯১ ভাগ পায়	৫৬.৫	সেনাবাহিনীর শতকরা ৯ ভাগ পায়	৬.৫%
২। বে-সামরিক খাতে					
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার	৯%	কেন্দ্রীয় রাজধানী পরিচালনার নামে শতকরা ৮০ জন সরকারী আমলা অফিসারদের বেতন বাবদ	৪.০% ৪.০%	× শতকরা ২০ জন আমলা অফিসারদের বেতন বাবদ	১০%
(খ) প্রাদেশিক সরকার কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন, শিক্ষা,	২৮%	জন সংখ্যা ৫½ কোটি হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যা	১.০%	জন সংখ্যা ৭½ কোটি হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যা	১৪.০%

মোট বাজেট	শতকরা	পশ্চিম পাকিস্তান সাম্যের ভিত্তিতে	শতকরা	পূর্ব বাংলা সাম্যের ভিত্তিতে	শতকরা
স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক খাতে		*আমলা অফিসারদের বেতন বাবদ পূর্ব বাংলার বাজেট থেকে পাওয়া	১·২%	*শতকরা ৮০ জন পশ্চিম পাক আমলা অফিসারদের বেতন বাবদ পূর্ব বাংলার জনগণ বঞ্চিত হয়	১·২%
		*পূর্ব বাংলার বাজেটের বার্ষিক উদ্বৃত্ত অংশ (কেন্দ্রের মাধ্যমে)	২·৮%	*এসকল আমলা অফিসারদের ঔপনিবেশিক শোষকসুলভ স্বার্থপরতার কারণে "উদ্বৃত্ত" বা "খরচ হয়নি" বলে কেন্দ্র তথা তথা পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত যায় (পাক সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ প্রদত্ত বার্ষিক রিপোর্ট থেকে গৃহিত)	২·৮%

মোট বাজেট শতকরা ১০০ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তান ৮১.৫% ভাগ। পূর্ব বাংলার ১৯.৫% ভাগ এভাবে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণ থেকে শতকরা ৭৩ ভাগ আর্থিক সম্পদ আদায় করে বিনিময়ে দয়া করে বাৎসরিক বাজেটের ১৫.৪ ভাগ দান করে। এই ঘৃণ্য ঔপনিবেশিক শোষকরা পূর্ব বাংলার জনগণকে কৃতার্থ করতো, এবং এই শাসন ও শোষণকে মেনে নিয়েই পূর্ব বাংলার জনগণকে সন্তুষ্ট থাকতে হতো, কেননা তা না হলে নাকি ইসলাম, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও শক্তিশালী কেন্দ্র বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই ঔপনিবেশিক শোষণমূলক অবিচার ও অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদমুখর কণ্ঠকেই দেশদ্রোহিতার অপরাধে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন বর্বর শোষক-শাসক গোষ্ঠী বুলেট বেয়নেট দ্বারা স্তব্ধ করে দেবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার দ্বন্দ্ব

পাকিস্তানের বৃহৎ ধনিক শ্রেণীর তেইশটি পরিবার (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) পূর্ব বাংলার উঠতি ধনিক শ্রেণীকে শোষণের ক্ষেত্রে অধিকার অর্থাৎ বাণিজ্যিক সুবিধাদি থেকেও বঞ্চিত করে পূর্ব বাংলার কাঁচা মাল ও বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তারা পূর্ব বাংলার প্রায় সমগ্র শিল্পকে হয় নিজেরা একচেটিয়া ভাবে দখল করেছে (যেমন পাট, তুলা, চা ইত্যাদি শিল্পের সমগ্র কলকারখানা ও বাগানের মালিক হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিপতিরা), নতুবা সঙ্কোচন নীতির মাধ্যমে তাদেরকে উচ্ছেদ করেছে (যেমন পূর্ব বাংলার লুপ্তপ্রায় বিভিন্ন কুটিরশিল্প)। এমনকি পাকিস্তানের সমগ্র ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকরাও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। বাস্তবপক্ষে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানী শোষক ও শাসকেরা একটি কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্র এবং নিজেদের উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজার হিসাবে ব্যবহার করে আসছে।

সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পাকিস্তানের শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর পূর্ব বাংলার জনগণের উপর এই ঔপনিবেশিক শোষণ (একচেটিয়া পুঁজির শোষণ, কুক্ষিগত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শোষণ, সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার শোষণ অগণতান্ত্রিক দমনমূলক রাজনৈতিক শোষণ) পাকিস্তানের শাসক ধনিক শ্রেণী ও পূর্ব বাংলার ধনিক শ্রেণীর মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। উনিশশ পঁয়ষট্টি সালে পূর্ব বাংলার সামন্ত ও ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় খানিকটা শোষণের অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের একচেটিয়া শাসক ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। উগ্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে ছয় দফার এ আপোষের রাজনীতি পূর্ব বাংলার শোষিত জনগণকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু উনিশশ একাত্তর সালে পূর্ব বাংলার রাজনীতি সচেতন এই সংগ্রামী জনগণের চাপে পড়েই পূর্ব বাংলার সামন্ত ধনিক শ্রেণীর নেতা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব সরাসরি আপোষের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী তাদের শাসন ও শোষণ বজায় রাখার স্বার্থে উলঙ্গ ভাবে ধনিক শ্রেণী সহ পূর্ব বাংলার জনগণের উপর চালিয়েছে পৈশাচিক আক্রমণ।

পূর্ব বাংলার মুক্তি যুদ্ধ চলছে এবং চলবে। পূর্ব বাংলার শোষিত নিপীড়িত জনগণের এই বিপ্লবী যুদ্ধের আঘাতে ভেঙ্গে পড়ছে শোষক ও শাসক শ্রেণীর প্রতিটি শোষণের দেয়াল। শোষণ ও শাসন রক্ষা কল্পে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিষ্টরা পূর্ব বাংলার বুকে আজ যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে সে সঙ্কটের বেড়াজালে তারাও আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পূর্ব বাংলার ব্যাপক কৃষক ও শ্রমিক হত্যার ফলে পূর্ব বাংলার কৃষিকর্ম হয়েছে ব্যাহত, কলকারখানা হয়েছে বন্ধ। রপ্তানীযোগ্য পণ্য পাট, তুলা, চা, চিনি, চামড়া, কাগজ, নিউজ প্রিন্ট সার ও সিমেন্টের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবার ফলে পাকিস্তানী শোষক ও শাসকরা শতকরা তিয়াত্তর ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারছেনা। শুধু তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও শিল্পের সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে, কারণ সেখানকার কলকারখানার অধিকাংশ খুচরা অংশই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়, রপ্তানী বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমদানী বন্ধ হওয়ায় খুচরা অংশের অভাবে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয় কেন্দ্র ছিল পূর্ব বাংলার বাজারসমূহ; বর্তমানে উক্ত বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত সামগ্রী অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে। উৎপাদিত পণ্যের কাটতি না হওয়ায় ঐ স্থানের বস্ত্র শিল্প, রেয়ন শিল্প বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মেশিন টুলস, চীনামাটির তৈজসপত্র, ইলেকট্রিক সরঞ্জাম ও খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই যা পশ্চিম পাকিস্তানের মেহনতী মানুষকে সংগ্রামী ও বিপ্লবমুখী করে তুলছে। বর্তমানে পূর্ব বাংলা ও একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের এই তীব্র শিল্পসঙ্কট পাকিস্তানী শাসক ধনিক গোষ্ঠীকে বিব্রত ও দিশেহারা করে তুলছে।

এছাড়া পূর্ব বাংলা থেকে রাজস্ব খাতে বৎসরে আদায়ীকৃত আঠার কোটি টাকা, সড়ক পরিবহন, রেল, নৌপরিবহন, ডাক ও তার, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সরকারী সংস্থাগুলি থেকে আদায়ীকৃত বৎসরে প্রায় তিরিশ কোটি টাকা থেকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী হচ্ছে বঞ্চিত। ইতিমধ্যেই পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ব্যাঙ্কসমূহ থেকে প্রায় ষাট কোটি টাকা হয়েছে অপহৃত। পূর্ব বাংলার যুদ্ধ পরিচালনা করতে শাসক গোষ্ঠীকে দৈনিক খরচ করতে হচ্ছে প্রায় এক কোটি টাকা। নরপিশাচ ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার, নির্মম গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও নারী নির্যাতনের সংবাদ

আজ বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের জনগণের তীব্র ঘৃণা কুড়োচ্ছে ; তাই পাকিস্তানের শাসক ও শোষক ক্ষমতাসীনদের শত আবেদন সত্ত্বেও বৈদেশিক সাহায্য লাভে পাকিস্তান হয়েছে ব্যর্থ। মোটকথা উপরোক্ত কারণে পাকিস্তান আজ একটি সম্পূর্ণ দেউলিয়া স্থিতিহীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান বর্তমান আর্থিক সঙ্কট আজ পাকিস্তানের শাসক ও শোষক ধনিক শ্রেণীকেও গ্রাস করতে উদ্যত। এমনি দিশেহারা অবস্থায় তারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য ধর্ণা দিয়ে বেড়াচ্ছে। বৈদেশিক ঋণের দেয় সুদ পরিশোধে অক্ষমতা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নিকট সময় চেয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে, এমন কি সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীদের নির্ধারিত পারিশ্রমিক প্রদান করতেও পাকিস্তান সরকার অক্ষমতা প্রদর্শন করেছে, অবশেষে একশ টাকা ও পাঁচশ টাকার নোট বাতিল করে দিয়ে আর্থিক সঙ্কটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত পাকিস্তানের শোষক শ্রেণী এটাই প্রমাণ করে চলেছে যে, বিশ্ব ইতিহাসের পরিচালক শক্তি জনগণের সামনে অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের মত তারাও আজ এক কাগুজে বাঘ ছাড়া কিছুই নয়।

পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রাম ও গেরিলা যুদ্ধ

ঐতিহাসিক পটভূমি

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনগণ আজ সকল শোষণ ও শাসনের দুঃখময় বন্দিত্ব থেকে মুক্তির কামনায় শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিজদিগকে সশস্ত্র করে তুলেছে। এই মুক্তি যুদ্ধের সূচনার মূলে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে জনগণের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য শোষক শ্রেণীর শোষণনিপীড়নের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। স্থানীয় সামন্তবাদী শোষণ, পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের (বিশেষতঃ সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সহযোগিতায় ইংগমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ) শোষণে জর্জরিত পূর্ব বাংলার জনগণ আজ সর্বহারা। এই সর্বহারা জনগণই আজ এ সকল শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লবী, বিদ্রোহী; বিশ্বের সংগ্রামী ইতিহাসের অন্যতম সৃষ্টি কর্তা আজ তাঁরাই। সকল শোষক ও শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার শোষিত নিপীড়িত শ্রেণীর শোষণ ও শাসন থেকে এই সশস্ত্র মুক্তির যুদ্ধ—শোষক এবং শোষিত শ্রেণীর টিকে থাকার প্রশ্নে সশস্ত্র এক সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে হয় পূর্ব বাংলার বীর বিপ্লবী জনগণ তাদের শত্রু শোষক শ্রেণীকে সমূলে উৎখাত করে তাঁদের বিজয়কে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, নচেৎ শোষক শ্রেণীর দ্বারা পরাজিত হয়ে আবার শোষিত জীবনের বন্দিত্বকে বরণ করে নেবে; জয়-পরাজয় ছাড়া মধ্য কোন পথ আর নেই। শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যকার এই আপোষহীন দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে শ্রেণীসংগ্রামেরই এক পর্যায়—শ্রেণীসংঘর্ষ।

গেরিলা যুদ্ধ কি?

দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী এই শ্রেণীসংগ্রামে পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক শ্রেণী যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষক শত্রুর মোকাবেলা করবেন তখনই এই যুদ্ধ জনযুদ্ধের রূপ লাভ করবে এবং প্রতিষ্ঠিত করবে বিজয়ের গ্যারান্টি। কিন্তু প্রথম অবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক সচেতন অগ্রবাহিনীই শক্তিশালী শত্রুকে আড়াল থেকে আঘাত হেনে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা চালাবে। শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত জনগণের পক্ষ থেকে এই আড়াল যুদ্ধের নামই

হলো গেরিলা যুদ্ধ। পূর্ব বাংলার বর্তমান বিপ্লব অতি প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে এবং বর্তমানে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে তা আবশ্যকীয় ভাবেই গেরিলা যুদ্ধ। উন্নততর ট্রেনিং প্রাপ্ত, উন্নততর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রসম্বলিত গণবিরোধী ফ্যাসিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জনগণের পক্ষে গেরিলা যুদ্ধই একমাত্র পথ। মুখোমুখি বা অবস্থানিক (positional) যুদ্ধ এড়িয়ে ইতস্তত:-বিক্ষিপ্ত ভাবে তীব্র অথচ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গুপ্তস্থান থেকে প্রচণ্ড আঘাত করে দ্রুত জনগণের মধ্যে মিশে যাওয়া এবং দীর্ঘকাল ধরে ক্রমাগত বিরামহীন ভাবে অসংখ্য আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে ক্রমশ দুর্বল ও নিশ্চিহ্ন করাই গেরিলা যুদ্ধের মূল নীতি ও কৌশল। তাছাড়া গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম কৌশল হচ্ছে নিজেরা যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করে শত্রুর বিরাট রকমের ক্ষয়-ক্ষতি করা। বিজয়ের একমাত্র সুনিশ্চিত এবং পরীক্ষিত পথ হলো শত্রুর অবস্থানের উপর যথাসময়ে যথাযথ আক্রমণ। গেরিলা যুদ্ধ নিঃসন্দেহে একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ, যার দ্বারা শত্রুর হয় প্রবল ক্ষয়ক্ষতি এবং নিজেদের হয় আত্মরক্ষা। সুতরাং গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক অথচ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ।

গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন স্তর

(ক) যুদ্ধ-পূর্ব সাংগঠনিক প্রস্তুতি : শত্রুর দুর্বলতম এলাকাকে (গ্রামাঞ্চল) বেছে নিয়ে এ সময়ে গেরিলাদের গণসংযোগের দিকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হয়। গেরিলারা যেন কোনক্রমেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, বরং স্থানীয় জনগণের অংশ হিসাবেই ঐ এলাকায় তাদের ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে। তার জন্য অবশ্যই সঠিক রাজনৈতিক পথ জনগণের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। স্থানীয় জনগণেরই সাহায্যে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, গোপন যোগাযোগব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণব্যবস্থা ও অস্ত্রসংগ্রহের ব্যবস্থা। অনেক সময় শত্রুপক্ষের যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য স্থানীয় এলাকার প্রকাশ্য পথ ঘাট ও পুল ভেঙ্গে দিতে হয় এবং তা ঐ স্থানীয় এলাকার জনগণের অনুমতি নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই করতে হবে। এভাবে প্রস্তুতিপর্ব চলতে থাকে সম্পূর্ণ গণসংযোগের মাধ্যমে।

(খ) প্রাথমিক অবস্থা : এই অবস্থায় শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে, তাছাড়া অভিজ্ঞতার অভাবে সমূহ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এ সময় মাঝে মাঝে

বিক্ষিপ্ত ভাবে আক্রমণ করেই পালাতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক অভিযানের পরই সাহস, অভিজ্ঞতা ও অস্ত্র সংগ্রহের ফলে গেরিলাদের বলবৃদ্ধি হতে থাকে। স্থানীয় জনগণ আরো সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। তাদের একটা অংশ সরাসরি গেরিলা বাহিনীতে জনগণের মূল শক্তি হিসাবে যোগ দেয়। এতে গেরিলাদের উৎসাহ ও মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। তারা আরো সাহসের সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করতে অনুপ্রাণিত হয়।

(গ) **মাধ্যমিক অবস্থা :** এ সময় গেরিলারা জনগণের সহযোগিতায় বার বার শত্রুকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করে দেয়। এসময় শত্রুর যোগাযোগব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট-পুল-সেতু ও তার যোগাযোগ বিধ্বস্ত করা গেরিলা যুদ্ধের একটি অঙ্গ। এতে শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা বিলম্বিত বা বন্ধ হবে, শত্রুরা নিজেরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, গেরিলাদের জন্য আক্রমণের সুবিধা হবে এবং শত্রুদের ধ্বংস করে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া যাবে। ক্রমে গেরিলারা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

(ঘ) **উচ্চস্তর অবস্থা :** এই স্তরে শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণসংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে নিজেদের এলাকা আরো বিরাট হয়ে উঠবে। সেই সঙ্গে গড়ে উঠবে আরো স্থানীয় গেরিলা ইউনিট। এ সময় নিকটস্থ অন্যান্য ঘাঁটি এলাকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং সম্ভব হলে দুই ঘাঁটির মধ্যবর্তী এলাকার জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত করে ঐ স্থানে নূতন ঘাঁটি ও স্থানীয় গেরিলা ইউনিট গঠন করা অবশ্য কর্তব্য। এ সময় বিরাট এলাকাব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আক্রমণে শত্রু ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় ও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে গেরিলারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ, শিক্ষিত, দক্ষ এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অপেক্ষাকৃত বড় ও দীর্ঘকালব্যাপী আক্রমণ চালিয়ে উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করতে পারে। বিস্তীর্ণ এলাকা গেরিলাদের দখলে চলে আসে এবং শত্রুমুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়। এই স্তরে গেরিলারা যে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাকে অনেকটা চলমান যুদ্ধ বলা চলে। পরবর্তী স্তরেই গেরিলারা নিয়মিত গণবাহিনীতে পরিণত হয়।

পূর্ব বাংলার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা

পূর্ব বাংলার জনগণের গত কয়েক মাসের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই কোন প্রকার আপোষ-আলোচনা ও রাজনৈতিক সমাধানের দ্বারা, বা বুর্জোয়া নির্বাচন ও পার্লামেণ্টারী প্রথার মাধ্যমে

কোন দেশের মুক্তি আসতে পারেনা। নিরস্ত্র জনতার ব্যাপক অভ্যুত্থানও মুক্তির নির্ধারক নয়। জনগণের সশস্ত্র গণবাহিনী পরিচালিত আপোষহীন সংগ্রামী যুদ্ধই মুক্তির একমাত্র পথ। জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বা ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব নয়; মেহনতী জনগণ তথা কৃষক শ্রমিকরাই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার অধিকারী ও মূলশক্তি, যাদের ঐক্যবদ্ধ ও রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করেই কেবলমাত্র বিজয় অর্জন সম্ভব। শহর থেকে (শত্রু যেখানে শক্তিশালী) মুক্তি যুদ্ধের সূচনা ও স্বল্প সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সুবিধাবাদী প্রচেষ্টা, এবং উন্নত মানের আধুনিক অস্ত্রসম্বলিত যুদ্ধ-অভিজ্ঞ প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াইয়ের প্রচেষ্টা যে আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র আজ তা অতীব সুস্পষ্ট। শত্রু যেখানে দুর্বল অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় এলাকার জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে ঐক্যবদ্ধ করে স্থানীয় এলাকাকেই ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তুলে সম্পূর্ণ গোপন গেরিলা কায়দায় তীব্র অথচ ক্ষিপ্র আক্রমণ পরিচালনার মাধ্যমে শত্রুকে পর্যদস্ত করার পথই একমাত্র সঠিক পথ। গেরিলা যুদ্ধই প্রাথমিক অবস্থায় শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে একমাত্র মোক্ষম উপায়, যার দ্বারা শত্রু ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকবে। পক্ষান্তরে গেরিলারা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে, মনোবলে হবে আরো বলীয়ান এবং পরিণামে অর্জন করবে জনগণের বিজয়।

কারা গেরিলা হবেন?

উন্নততর আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত শক্তিশালী, অভিজ্ঞ ও সুশৃঙ্খল সেনা-বাহিনীর বিরুদ্ধে নাম মাত্র অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্যই যারা গেরিলা হবেন তাদের মাঝে কতগুলি সুনির্দিষ্ট গুণাবলীর সমন্বয় ঘটাতে হবে।

প্রথমতঃ গেরিলাদের হতে হবে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন। তাকে অতি অবশ্যই সচেতন ভাবে জানতে হবে কেন সে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে? এই যুদ্ধের প্রকৃত শত্রু কে এবং মিত্র কে? এই যুদ্ধের মূল লক্ষ্য কি? এবং তার রূপরেখা সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। **দ্বিতীয়তঃ** গেরিলাদের হতে হবে রাজনৈতিক সংগঠক। প্রতিটি গেরিলাকেই মনে রাখতে হবে যে তারা জনগণেরই একজন এবং তাদের

প্রতিটি কাজ জনগণের সেবা করার মনোবৃত্তি থেকেই উদ্ভূত। তাই গেরিলারা যেখানে যাবেন, সঠিক রাজনীতি ও জনগণের সেবা করার মনোবৃত্তি নিয়েই ঐ স্থানের জনগণকে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে তাঁদেরকে স্বপক্ষে টেনে এনে, এমন কি তাঁদের মধ্য থেকেও গেরিলা দল সৃষ্টি করবেন। জনগণের উপর আস্থা, জনগণকে শ্রদ্ধা করা ও তাঁদের উপর নির্ভরশীল হয়েই এ সমস্যার সঠিক সমাধান করা সম্ভব। এর জন্য বিভিন্নভাবে জনগণের মধ্যে সংস্কারমূলক কাজও করা প্রয়োজন। জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে স্বপক্ষে আনতে প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংস্কারমূলক কাজের প্রভাব অনেকখানি কার্যকরী হয়ে থাকে। সুতরাং গেরিলাদের অবশ্যই সমাজ সংস্কারক হতে হবে। তাছাড়া যোদ্ধা হিসাবে সাধারণ মানবিক গুণগুলির বিকাশ ঘটানো মূলগতভাবে আবশ্যকীয় এবং প্রয়োজনীয়। প্রতিটি গেরিলাকে হতে হবে আদর্শ দেশপ্রেমিক, চরিত্রবান, অধ্যবসায়ী, প্রখর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, অন্যান্য কেডারদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, জনগণের প্রতি কোমল অথচ শত্রুর প্রতি কঠোর ক্ষমাহীন নির্মম-নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাঁদের থাকতে হবে নেতৃত্ব দেবার মত যোগ্যতা, নিজস্ব বাহিনী করার মত অভিজ্ঞতা এবং অস্ত্র পরিচালনা করার মত ক্ষমতা। তাঁদের হতে হবে অসীম সাহসী, দৃঢ় মনোবলে বলীয়ান সুশৃঙ্খল ও ধীর স্থিরভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার মত চিন্তাশীল। তাদের হতে হবে অমানুষিক পরিশ্রমী ও প্রবল কষ্টসহিষ্ণু।

যুদ্ধের প্রথমদিকে দেশপ্রেমের তাগিদে ও প্রাণের আবেগে বহু ছাত্র মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। তাদের মধ্যে এসকল মানবিক গুণগুলি নাও থাকতে পারে। তাদের মধ্যে কমরেডসুলভ সহানুভূতি দ্বারা এই মানবিক গুণগুলির বিকাশ ঘটাতে হবে। এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপ পরিচালক সংগঠনের উপর ন্যস্ত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র ছাত্র ও মধ্যবিত্তদের দ্বারা গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণ কৃষক শ্রমিক (যারা জনগণের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ) শ্রেণীই এই গেরিলা যুদ্ধের মূলশক্তি ও দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ পরিচালনা করার মত উপযুক্ত ও আদর্শগত নেতা। গেরিলা যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রূপ দিতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কৃষকশ্রমিকমেহনতী জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে এই গণযুদ্ধে সমবেত করেই

কেবল এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

শৃঙ্খলা গেরিলাদের জন্য একটি অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য রণ-কৌশল। শৃঙ্খলা হচ্ছে সঠিক রাজনৈতিক চেতনা, দৃঢ় মনোবল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ; শৃঙ্খলা হচ্ছে জনগণ ও সংগঠনের সেতুবন্ধ—গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার একটি প্রধান অঙ্গ। শৃঙ্খলা গেরিলা-যুদ্ধের অন্যতম একটি মূল রণকৌশল এবং বিজয়ের অন্যতম একটি মূল শর্ত। বিশ্বের মেহনতী জনগণের মুক্তির পথপ্রদর্শক মহান মার্ক্স-লেনিন এবং মাও সে তুং এই শৃঙ্খলার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। সামগ্রিক বিজয় অর্জনের জন্য শৃঙ্খলা সম্পর্কে মহান মাও-এর তিনটি মূল্যবান উপদেশ এবং মনোযোগ দেবার আটটি ধারা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তিনটি বৃহৎ শৃঙ্খলা—

(১) সকল কার্যক্রিয়ায় আদেশ মেনে চলুন;

(২) জনসাধারণের কাছ থেকে একটি সুচ কিংবা সুতাও নেবেন না;

(৩) দখলীকৃত সমস্ত জিনিস জমা দেবেন।

মনোযোগ দেবার আটটি ধারা :—

(১) ভদ্র ভাবে কথা বলুন;

(২) ন্যায্যমূল্যে কেনা বেচা করুন;

(৩) ধার করা প্রতিটি জিনিষ ফেরত দিন;

(৪) কোন জিনিষ নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ করুন;

(৫) লোককে মারবেন না, গাল দেবেন না;

(৬) ফসল নষ্ট করবেন না;

(৭) নারীদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করবেন না;

(৮) বন্দী সৈন্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না।

গেরিলা রণনীতি ও রণকৌশল

পূর্ব বাংলায় শোষিত নিপীড়িত জনগণের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। তাঁদের দুঃখ কষ্টের মূল সকল শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর এই আপোষহীন সশস্ত্র সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামেরই এক পর্যায়, শ্রেণীসংঘর্ষ। মার্ক্স-লেনিনবাদ বিজ্ঞান সম্মত প্রয়োগশীল একটি বিজ্ঞান। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও শোষকশ্রেণীকে পরাজিত করে বিপ্লবী জনগণের বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পূর্ব বাংলার বীর গেরিলাদের এই মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের নিয়ম কানুনগুলো যথা—সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

ও মূলনীতি, সুস্পষ্ট রণনীতি, সময়োপযোগী রণকৌশল, যথোপযুক্ত রণক্ষেত্র ও সঠিক শত্রু-মিত্র নির্ধারণে এবং রাজনৈতিক সচেতন সুশৃঙ্খল গণবাহিনী পরিচালনায় সক্ষম সর্বহারা কৃষক শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শনিষ্ঠ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী একটি বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব ইত্যাদি সৃজনশীল ভাবে যথাযথ মেনে চলতে হবে।

মূল লক্ষ্য ও শক্তিশালী আদর্শ

মূল লক্ষ্য এবং আদর্শ একটি বাস্তবধর্মী কর্মসূচী। দেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম, জনগণের সামাজিক জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধিশালী এবং সম্মানিত করে তোলার এবং ক্রমান্বয়ে শোষনহীন সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। এ ব্যাপারে কয়েকটি বিপ্লবী স্তর পার হতে হবে।

(ক) পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ থেকে পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন এবং এই একই সংগে

(খ) আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করে নিজস্ব জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ তথা গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(গ) সাম্রাজ্যবাদী (বিশেষতঃ ইংগমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী) সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী এব ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী প্রভাবমুক্ত জাতীয় মুক্তি ও সার্বভৌমত্ব অর্জন।

(ঘ) সমবায় প্রথার মাধ্যমে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(ঙ) উৎপাদনের সামগ্রীকে রাষ্ট্রীয়করণ তথা জনগণের যৌথ মালিকানা প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উত্তরণ।

(চ) দুনিয়ার সকল সর্বহারাদের সঙ্গে একাত্ম এবং ঐক্যবদ্ধ করণ। এই সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানের জন্য প্রয়োজন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুং-এর পর চিন্তাধারার সঠিক আদর্শগত ভিত্তি। আদর্শ নিছক আবেগমূলক হলে পরিণামে বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। জনগণের মুক্তির জন্য জনগণের গ্রহণযোগ্য বাস্তব কর্মসূচী সম্বলিত এমন এক আদর্শের প্রয়োজন যার প্রেরণায় জনগণ ও গেরিলা যোদ্ধারা সর্বপ্রকার ত্যাগ এমনকি মৃত্যুবরণ করতেও দ্বিধা করবে না। জনগণের সংগঠনকেই গেরিলা ও জনসাধারণের মধ্যে এই আদর্শের ব্যাখ্যা ও ব্যাপক প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। এমনকি রাজনৈতিক সচেতন যে কোন গেরিলা

এবং স্থানীয় সংগঠককেও এ দায়িত্ব যথাযথ পালন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

সঠিক নেতৃত্ব ও মূল শক্তি

উপরোক্ত লক্ষ্য এবং আদর্শকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে প্রয়োজন একটি সঠিক নেতৃত্বের। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীই এই দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার একমাত্র যোগ্য অধিকারী। পূর্ব বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এই কৃষিপ্রধান দেশের কৃষক সমাজ হলো এই বিপ্লবের মূল শক্তি। পূর্ব বাংলার কৃষক ও শ্রমিক তথা মেহনতী জনগণের সুদৃঢ় ঐক্যই হচ্ছে এই মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের একমাত্র গ্যারান্টি। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী রাজনৈতিক ভাবে তাঁদের শ্রেণীচ্যুত হয়ে সর্বহারা জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সর্বহারার রাজনীতিকে নীতিগত ভাবে নিজের জীবনে গ্রহণ করে অতঃপর জনগণের অগ্রবাহিনী হিসাবে নিরলস ভাবে জনগণকে নিয়ে সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে দৃঢ় পদভরে এগিয়ে যাবে।

মিত্র শিবির

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, কুটিরশিল্পী, ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা শ্রেণীগত ভাবে বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধের মিত্র শিবিরের লোক। দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক ও প্রতিষ্ঠিত ধনী কৃষকরা হচ্ছে দোদুল্যমান মিত্র।

শত্রু শিবির

(১) পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক শোষক গোষ্ঠী, তাদের রক্ষীবাহিনী—পুলিশ মিলিটারী এবং তাদের সকল অনুচর তাঁবেদার বাহিনী।

(২) দেশীয় সামন্তবাদী শোষক গোষ্ঠী তথা জোতদার মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার, আমিনদার, মজুতদার, চোরাকারবারী, ঠগ জোচ্চোর ও বদমাতব্বর ও তাদের সকল দালাল বাহিনী,

(৩) অন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ (ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ)

(৪) সংশোধনবাদী সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও

(৫) ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রসারণবাদের দেশী ও বিদেশী সকল অনুচর তাঁবেদার দালাল শ্রেণী।

এই শত্রুরা পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল জনগণের শত্রু, বিপ্লবের শত্রু। অবস্থান ও রূপ ভিন্ন হলেও এই শত্রুগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার বিপ্লবকে ধ্বংস করে দিতে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর চরমভাবে নির্মম শোষণকে বজায় রাখতে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ।

পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই সকল শোষক-শাসক শ্রেণীকে একই সঙ্গে আঘাত হানতে হবে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে আক্রমণ পক্ষান্তরে সমগ্র শত্রু গোষ্ঠীকেই বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেবে।

নমনীয় কৌশল

যে সকল দেশীয় সামন্ত শত্রু গোষ্ঠী বা পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষক গোষ্ঠীর দেশীয় অনুচর শ্রেণী বিনা সর্তে বিপ্লবী জনগণের নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং সচেতন ভাবে শোষকের ভূমিকা পরিত্যাগ করে জনগণের পার্শ্বে এসে দাঁড়াবে এবং কেবলমাত্র তাদেরকেই ক্ষমা করা হবে। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অন্য কোন শোষক-শত্রুদের প্রতি নীতিগত ভাবে নমনীয় হবার আবশ্যকীয় কোন প্রয়োজন নেই। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনার জন্য জনগণের বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এই সকল গণদুশমনদের নির্মুল করে জনগণের গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করাই হবে সঠিক বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ড। এই বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে বিপ্লবী গেরিলা যোদ্ধাদের অতি সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে সামনে রেখেই ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী গুপ্তহত্যার কৌশলকে যতদূর সম্ভব পরিহার করে চলতে হবে। সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নয় বরং শত্রুকে সন্ত্রস্ত করতে গিয়ে জনতা যাতে সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে সেই দিকেই দৃষ্টি রেখেই এই ক্রিয়াকাণ্ডের সমাধান করতে হবে। সম্ভব হলে গণ-আদালত ডেকে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জনগণের রায় অনুযায়ীই এ কাজ করার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

গণসংযোগ

গেরিলা যুদ্ধ গেরিলাদের জন্য গণসংযোগ একটি অন্যতম দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য গেরিলাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের

যুদ্ধ, কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাঁদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। পূর্ব বাংলার বেশির ভাগ জনগণই কৃষক ও শ্রমিক, এই শ্রমিক কৃষক জনতাকে বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে টেনে আনতে হবে এবং তাদের হাতেই বিপ্লবী যুদ্ধের নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে হবে, কারণ শ্রেণীগতভাবে মেহনতী জনগণই বিপ্লবী যুদ্ধের মূল শক্তি এবং নেতৃত্ব দেবার যোগ্য অধিকারী। এটা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত যে জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই দীর্ঘকাল ধরে অসীম ধৈর্য ও মনোবল সহকারে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে। একমাত্র গণসংযোগের মাধ্যমেই ব্যাপক জনতাকে বিপ্লবী যুদ্ধে পক্ষে পাওয়া যাবে এবং রাজনৈতিক সচেতন ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে গেরিলা যুদ্ধে সামিল করা যাবে এবং তখনই বিজয়ের পথ সুপ্রসস্ত ও সুনিশ্চিত হবে। ব্যাপক জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে স্বপক্ষে পেলে গড়ে উঠবে জনগণের গণফৌজ—যে "গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকেনা"। গেরিলারা "নিছক লড়াই করার জন্যই লড়াই করেনা, পরন্তু লড়াই করে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার চালানোর জন্য, জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার জন্য, তাঁদের সশস্ত্র করার জন্য এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে তাঁদের সাহায্য করার জন্য।" সুতরাং প্রতিটি গেরিলাকে গণসংযোগের প্রতি গেরিলা যুদ্ধের অতি প্রাথমিক কার্যরূপে যথেষ্ট মনোযোগী হতে হবে। গেরিলারা যেখানেই যাননা কেন জনগণের সঙ্গে তাদের আবশ্যকীয় ভাবেই ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তাঁদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে এবং একাত্ম হয়ে তাঁদেরকে রাজনৈতিক সচেতন করে তুলতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিপ্লবী যুদ্ধে সামিল করতে হবে। তবেই তাঁরা হবেন সত্যিকারের আদর্শ গেরিলা।

ঘাঁটি এলাকাঃ গেরিলা যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কাজ হলো ঘাঁটি এলাকার পত্তন। ঘাঁটি এলাকা সঠিক রাজনৈতিক ও গণ-সংযোগের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা যায়। ঘাঁটি এলাকা সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় জনগণের মধ্য গেরিলাদের মিশে থাকার অবস্থা সৃষ্টি করা। সুতরাং জনগণকে সচেতন করে স্বপক্ষে আনতে পারলে তাঁরাই খাদ্য, আশ্রয়, বিশ্রামের পরিবেশ, সংবাদ ও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম যোগাবেন। জনতা থেকেই দলে দলে নূতন যোদ্ধা আসবে। প্রতিটি গেরিলাকে এই

কারণে স্থানীয় ঐতিহ্য, লোকাচার এবং রীতিনীতির (যথেষ্ট প্রগতিশীল না হলেও) প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। একমাত্র স্থানীয় সামন্তবাদী অত্যাচার অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধেই গেরিলারা জনগণের পক্ষ থেকে সরাসরি রুখে দাঁড়াবে, গণশত্রুদের বিরুদ্ধে গণআদালতের মাধ্যমে যথাযথ শাস্তিমূলক (মৃত্যুদণ্ড সহ) ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অন্য কোন স্থানীয় লোকাচার যা শোষণের সঙ্গে তেমন সম্পর্কিত নয়, তাকে প্রকাশ্যে সরাসরি সংস্কার করার বাধ্যতামূলক কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে এ ধরণের সংস্কারমূলক কাজ করতে গিয়ে অনেক কমরেড বহু বাধার সম্মুখীন হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে সতর্কতামূলক ভাবে গ্রহণ করেই গেরিলাদের এগিয়ে যেতে হবে। গেরিলারা স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য যত্নশীল হবে ; বিশেষ করে কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য উৎসাহ-মূলক সকল প্রচেষ্টা চালাবে এবং সম্ভব হলে এই সকল কৃষি ও শিল্প কর্মে তাঁদের সাহায্য করবে। গ্রামবাসীদের প্রয়োজনে ডাক্তার ঔষধপত্রাদি দিয়ে, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে এবং রাস্তাঘাট ও বাঁধ তৈরী ইত্যাদি গঠনমূলক কাজে তাঁদের সাহায্য করা বাঞ্ছনীয়। এমন কি বিশেষ ও জরুরী ক্ষেত্র ছাড়া শত্রুর স্থানীয় চর ও সাহায্যকারীকে জনগণের অনুমতি না নিয়ে বিনা বিচারে চরম শাস্তি দেওয়া উচিত হবে না।

ঘাঁটি এলাকার নিকটে গুপ্ত আশ্রয়ভূমি থাকলে গেরিলাদের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা আরো সহজতর হয়। প্রয়োজনের সময় লুকিয়ে থাকা, কাজ সেরে সহজে সরে পড়ার মত অবাধ বিচরণ ভূমি হিসাবে পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। ছোটখাট টিলা, জঙ্গলপূর্ণ এলাকা, ডোবা নালা ও পুকুর, নদী৷ পাড়ের ঢাল, শহর এলাকার অলিগলি, ছাদ, সেতুর নীচ, শত্রুর গোলাবিধ্বস্ত বাড়ী, এমন কি প্রয়োজন বোধে আবর্জনাবাহী ড্রেন ও ম্যানহোলকেও গুপ্ত পশ্চাদ-ভূমি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঘাঁটি এলাকা শত্রুর অবস্থানের যথেষ্ট দূর ও অনধিগম্য হওয়া চাই। এখানে অপেক্ষাকৃত বেশি অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম, খাদ্যশস্যের সঞ্চয় এবং রাজনৈতিক ও অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। আহত এবং পীড়িত যোদ্ধার চিকিৎসা, এমনকি দীর্ঘকাল লড়াইয়ে পরিশ্রান্ত গেরিলার বিশ্রাম ক্ষেত্র ওখানে হলেই ভাল হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এটাই হবে কতগুলি

গেরিলা ইউনিটের প্রধান দপ্তর (হেড কোয়ার্টার)। সেই সঙ্গে বিকল্প ঘাঁটি এলাকার ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে বিপদ আসলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সব কিছু সরিয়ে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে এই ঘাঁটি এলাকা গেরিলা যুদ্ধের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি, এবং "প্রস্তুতিবিহীন উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা নয় এবং এতে কোন উদ্যোগও থাকতে পারে না।"

যোগাযোগ ব্যবস্থা : বিভিন্ন গেরিলা ইউনিট, ঘাঁটি এলাকা, কার্য-দপ্তর ও পার্টি সংগঠনের মধ্য নিয়মিত গোপন ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেরিলা যুদ্ধের অপর একটি প্রস্তুতিমূলক কর্তব্য এবং এই ব্যবস্থা গেরিলা যুদ্ধে একটি অন্যতম কৌশল। দশ থেকে পনের মাইল অন্তর অন্ততঃ একটি করে গেরিলাদের ডাকঘর, চিঠিপত্র আদান-প্রদানকারী বাহক (কুরিয়ার), কয়েকজন পথপ্রদর্শক ও দু-তিনটি করে আশ্রয় ও অবস্থান কেন্দ্র স্থাপন করা সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনভাবে বিস্তার লাভ করবে যাতে এক জেলার পার্টি ও গেরিলা সংগঠনের সঙ্গে অন্য জেলার পার্টি ও গেরিলা সংগঠনের নিয়মিত যোগাযোগ ও সংবাদ বিনিময় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে। অদূর ভবিষ্যতে এটা সমগ্র দেশের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। যুদ্ধাবস্থায় কৌশলগতভাবে এ কাজে বৃদ্ধ স্ত্রী-লোক এমনকি বালক বালিকাদেরও ব্যবহার করা চলে, শত্রু অধ্যুষিত এলাকায় এরাই অধিকতর নিরাপদ মাধ্যম।

গোপনীয়তা : গেরিলা যুদ্ধে সাফল্য লাভের অপর অন্যতম সর্ত ও কৌশল হচ্ছে গোপনীয়তা। গেরিলা বাহিনীর সঞ্চালক মণ্ডলীর প্ল্যান, অস্ত্র, সাজসরঞ্জাম ও খাদ্য সামগ্রীর মজুত-অবস্থান সম্পর্কে যাতে অন্য কেউ না জানতে পারে তার জন্য গোপনীয়তা রক্ষা করা অতীব গুরুত্ব-পূর্ণ গেরিলা দায়িত্ব। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নে গেরিলারা নিয়মতান্ত্রিক অথবা আবেগ বা শ্রদ্ধা চালিত হতে বাধ্য নয়। নজর রাখতে হবে প্রত্যেক গেরিলা ইউনিটের সৈন্যদের চিঠিপত্রের এবং বাইরের ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযোগের উপর। সংগঠনের ও ইউনিটের বা এলাকার বাইরে বিনানুমতিতে যোগাযোগ না রাখাই শ্রেয়, আপাতদৃষ্টিতে ঐ যোগাযোগ যত নির্দোষই দেখাক না কেন। এ কারণে অতিরিক্ত কৌতুহল, উত্তেজনা আবেগ প্রকাশ এবং অনাবশ্যক কথা বলা গেরিলাদের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। পত্রের বা সংবাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বিশেষ সঙ্কেত ব্যবস্থা

থাকবে ; সেটা বার বার বদলাতে হবে এবং বর্তমান এই বিশেষ অবস্থায় তা প্রতিটি গেরিলা ইউনিট বা এলাকার মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

গুপ্তহত্যামূলক সন্ত্রাসবাদকে গেরিলা ঘাঁটি সৃষ্টি করার প্রথমদিকে গেরিলা যুদ্ধের একটি কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ইহার পরিণাম বিরূপ হতে দেখা গেছে। শত্রুদের সন্ত্রস্ত করতে গিয়ে অনেক স্থানে এর ফলে মিত্র জনতাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তুলনামূলক ভাবে শত্রুর চেয়ে স্থানীয় ব্যক্তিরাই (রাজনৈতিকভাবে শোষক শত্রু নয় অথচ ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণে ভিন্ন মত পোষণ করে থাকে) বেশি হত হতে দেখা গেছে (যেমন পশ্চিম বাংলায়) ; ফলে ইহা জনগণের বিরূপতা অর্জন করে। কাজেই স্থানীয় কাউকে খতম করার পূর্বে সম্ভব হলে গণআদালতে তার বিচার করে জনগণের নিকট তার অপরাধের ও শাস্তির যথাযথ ব্যাখ্যা করেই একাজ সম্পন্ন করা উচিত। তাতে জনগণ অসন্তুষ্ট, রুষ্ট বা সন্ত্রস্ত হয় না, বরং তাদের শত্রুকে তারাই বিচারের মানদণ্ডে দণ্ডিত করে শোষণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্রিয় এবং সচেষ্ট হয়ে উঠবে। নিতান্ত নিরুপায় না হলে (তাও অতি সতর্ক ও গভীর বিচারের পর) সন্ত্রাসের এই গুপ্তপথ যথাসম্ভব বর্জন করাই শ্রেয়।

নূতন রিক্রুটের ব্যাপারে গোপনীয়তার প্রয়োজন সর্বাধিক। বেশ কয়েকদিন তাঁদের সম্পর্কে সকল তথ্য জানা প্রয়োজন। অতঃপর তাদের দ্রুত সর্বহারা রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করে সঠিকভাবে জনগণের সেবক সেনা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এ কাজে সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক কর্মীকে অসীম ধৈর্য এবং কমরেডসুলভ আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণের পরিচয় দিতে হবে। জনগণের প্রতি অতি সন্দেহবাদী হয়ে ওঠা কোন ক্রমেই উচিত হবে না, বিশেষতঃ সংগঠনের বহিরঙ্গিক প্রসারে ; কিন্তু আভ্যন্তরীণ সকল ব্যাপারে সতর্ক সাবধানতা আবশ্যক।

গুপ্ত তথ্য ও গুপ্তচর বিভাগঃ—গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম কাজ হচ্ছে শত্রুকে যথাযথ সঠিকভবে আক্রমণ করতে শত্রুর সম্বন্ধে নানাবিদ গুপ্ত তথ্য জোগাড় করা। এ কাজে সাধারণতঃ উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও অল্পবয়স্ক চতুর বালকদের নিয়োজিত করা যায়। এমন কি প্রয়োজন বোধে এই উদ্দেশ্যে দু-একজন গেরিলাকে শত্রুদের স্থানীয় সহকারী ও সরবরাহকারী হিসাবে কিছুদিন যাবৎ গুপ্তচরের অভিনয় চালিয়ে যেতে

হবে। এই ব্যাপারে সংশ্লিস্ট গেরিলাকে দক্ষ অভিনেতা, অত্যন্ত দৃঢ় ও ধৈর্যশীল এবং সদা সতর্ক হতে হবে। এই ব্যাপারে স্থানীয় এলাকার জনতার সাহায্য একান্তভাবে কাম্য।

গেরিলা যুদ্ধের পূর্বে শত্রুদের নিম্নলিখিত:বিষয়ে গুপ্ত তথ্য জানতে হবে। শত্রুদের অবস্থা ও অবস্থান, তাদের সংখ্যা, তাদের অস্ত্রের পরিমাণ ও ধরন, তাদের পাহারাদারের অবস্থান, ঘাঁটি এলাকা থেকে শত্রুর অবস্থানের দূরত্ব, আক্রমণ করার সুবিধামূলক দিক, পলায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে কিনা, শত্রুদের ব্যবহারিক পথঘাট, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ, ওদের সরবরাহকারী কে কে এবং কখন তারা সরবরাহ করে থাকে, আক্রমণ প্রাক্কালে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সঠিক পথে নিজস্ব জায়গায় ফিরে যাবার মত সঠিক চিহ্নের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি।

বিচক্ষণ গেরিলা নেতৃত্ব: গেরিলা সৈন্যদের মধ্যে শৃংখলা, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষা, প্রতিনিয়ত নিরলস অভ্যাস, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও প্রায় নিখুঁত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি অসীম ধৈর্য ও নৈরাশ্যহীনতা প্রতিটি গেরিলার জন্য অতি উচ্চমানে অপরিহার্য। এর জন্য প্রয়োজন বিচক্ষণ গেরিলা নেতৃত্বের। প্রায়ই গেরিলাকে একক ভাবে বা দুই তিন জনের ক্ষুদ্র দলে কাজ করতে হয় বলে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই একাধিক কর্মে সুদক্ষ, মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে উদ্যোগী ও পরিকল্পিতভাবে নেতৃত্ব দিয়ে কাজ করতে সক্ষম হওয়া চাই। সর্বোপরি গেরিলাদের অধৈর্য হওয়া একেবারেই চলবেনা। হয়ত কিছু আক্রমণ, ফাঁদ পাতা ব্যর্থ হবে, অনেক সময় হতাশা ও নৈরাশ্য দেহমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইবে; কিন্তু প্রত্যেক গেরিলাকেই এ সবের উর্দ্ধে উঠতে হবে। মনে রাখতে হবে দৃঢ় মনোবলই গেরিলাদের সবচেয়ে বড় শক্তি-সম্পদ যা শক্তিশালী শত্রুকেও পরাস্ত করতে কার্যকরী সহয়তা করে থাকে। মনোবল হারিয়ে কোন যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়।

গেরিলা নেতৃত্ব প্রায় সর্বত্র প্রথম দিকে আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকেই আসে; শারীরিক শ্রমশীলতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার জন্য মেহনতী জনতা তথা কৃষক-শ্রমিকরাই ভালো গেরিলা যোদ্ধা হবার যোগ্যতা রাখে। তবে বিশেষ টেকনিকেল কাজ, সুষ্ঠু প্রচার, রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক কাজের জন্য ছাত্র ও শিক্ষিত যুবক নিয়ে গড়া গেরিলা দলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সঠিক লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ : শত্রু সেনাদের আক্রমণ করার পূর্বে নিজস্ব গুপ্তচর বিভাগের মাধ্যমে শত্রুদের সকল তথ্য জানা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মহান মাও উপদেশ দিয়েছেন—"নিজেদের জানো এবং শত্রুকেও, তাহলে একশোটা লড়াই জেতা যায়।" তাই আক্রমণের পূর্বে সঠিক লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান বারবার যাতায়াত করে, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে গেরিলা যোদ্ধা-দিগকে লক্ষ্যভূমির রাস্তাঘাট, ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থান ও তার সুবিধা অসুবিধা, জলা ভূমির অবস্থান, আবহাওয়া, স্থানীয় অধিবাসী এমন কি বিশেষ পশুপক্ষী সম্পর্কেও জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে। পরবর্তীকালে যথাযথ কর্ম সম্পাদন করতে ঐ সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে।

গেরিলা ইউনিট : শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে এক স্থান ও একদিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করার চেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা ইউনিটে বিভক্ত হয়ে চতুর্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গেরিলা আক্রমণই জয়ের পরীক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত পথ। ৫ থেকে ৭ জনের সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা ইউনিট শত্রুকে ঘিরে ফেলে চতুর্দিক থেকে প্রচণ্ড অথচ দমকা আক্রমণ করে শত্রুকে বিব্রত-বিহ্বল ও দিশেহারা করে কাবু করা সহজ। স্থানীয় এলাকার গেরিলা সংখ্যার উপর ভিত্তি করেই ইউনিট গঠন করা সম্ভব; কয়েক বর্গমাইলের গেরিলাদের মধ্যে সুষ্ঠু গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় থাকলে এবং তাঁদের সংখ্যা পঞ্চাশ বা তার উর্ধ্বে হলে, এবং তাঁদের হাতে শত্রুকে মোকাবেলা করার মত সামান্য অস্ত্র থাকলে তাঁদের সমন্বয়ে একটি চলমান যোদ্ধা ইউনিটও গঠন করা যেতে পারে।

অস্ত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : গেরিলাযুদ্ধে অস্ত্রের সমস্যা একটি বড় সমস্যা। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারাই নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে শত্রুর অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে হবে এবং সেই অস্ত্র দ্বারাই চক্রবৃদ্ধি হারে আরো অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে আরো অস্ত্র সংগ্রহ করা যায়। সুবিধা মত স্থানে এ্যামবুশ করে শত্রুর ছোট ছোট ইউনিটকে খতম করা অস্ত্র সংগ্রহের একটি ভাল প্রচেষ্টা। মনে রাখতে হবে, শত্রুর অস্ত্রই আমাদের অস্ত্র যা শত্রুর কাছ থেকে আমাদিগকে ছিনিয়ে নিতে হবে। সুতরাং অস্ত্র সরবরাহের প্রধান এবং একমাত্র ক্ষেত্র হচ্ছে শত্রুদের অস্ত্র সম্ভার। বিশ্ব ইতিহাসের মুক্তিযোদ্ধারা এ ভাবেই শত্রুর অস্ত্রকে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং শত্রুর সেই অস্ত্র দ্বারা শত্রুকেই ঘায়েল

করেছে। এতে দুদিক থেকে লাভ, একই সময়ে শত্রু ধ্বংশ হয় নিরস্ত্র হয় বা দুর্বল হয়—তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়; অপর দিকে গেরিলাদের হাতে আসে শত্রুর অস্ত্র। তাঁরা আরো শক্তিশালী ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হতে থাকেন যা যুদ্ধে জয়ের সুনির্দিষ্ট এক গ্যারান্টি।

অস্ত্রশস্ত্রের বিষয়ে প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হলো শত্রুর দ্বারা ব্যবহৃত অস্ত্র ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে পূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান থাকা। কারণ শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রকে অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহার করতে হয়। ঐ রকম পরিস্থিতিতে ঐ সকল অস্ত্রের ব্যবহার না জানলে তা আরো বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এ ব্যাপারে একটা যথাযথ সতকর্তা অবলম্বন করা উচিত। অনেকে অস্ত্র হাতে পেয়েই শত্রু নিধনে নেমে যেতে চায়। কিন্তু সঠিক রাজনৈতিক জ্ঞান ও জনগণের সেবা করার মত মনোবৃত্তির জন্ম না দিতে পারলে সেই অস্ত্রধারণকারী দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চালতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং পরিণামে যুদ্ধে বিবিধ বিপর্যয় দেখা দেয়। এমন কি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে রাজনীতিবিহীন এ ধরণের অস্ত্রধারীকে ব্যক্তিগত কারণে আর্থিক লোভে নিরপরাধ ব্যক্তিহত্যা ও লুটতরাজ করতেও দেখা গেছে। সুতরাং রাজনীতি বর্জিত অস্ত্রধারী মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার পরিবর্তে এ ধরণের হঠকারী সমাজ বিরোধী কাজে অস্ত্রের অপব্যবহার করে মুক্তি যুদ্ধকে বিলম্বিত করে এবং সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক জ্ঞান-হীন ব্যক্তিদের এ ধরণের অস্ত্রের অপব্যবহারকে এখন থেকেই কঠোর ভাবে দমন করতে হবে। আমরা কোন ক্রমেই অস্ত্রকে আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দেবনা, বরং অস্ত্রকে আমরাই নিয়ন্ত্রিত করব। এই প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলার বাস্তব অভিজ্ঞতা সকলের নিকট শিক্ষণীয় হয়ে থাকা প্রয়োজন। মুক্তি যুদ্ধের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলার সামন্ত ও ধনিকদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ যখন নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয় তখন তাদের ছিল অফুরন্ত জনবল, ছিল প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু তাদের ছিল না জনগণের মুক্তির কোন রাজনীতি, ছিলনা কোন ঘাঁটি এলাকা, যা হচ্ছে মুক্তি যুদ্ধের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাই প্রথম দিকে ঢাকা কুমিল্লা ছাড়া পূর্ব বাংলার সবকটি শহর বন্দর ও গ্রাম এমনকি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সহ মিলিটারী কেন্টনমেন্টগুলি স্বতঃস্ফূর্ত জনতা কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পরও শত্রুর হাতে জনগণকে প্রাথমিক পর্যায়ে পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য হতে হয়েছে শুধু

মাত্র সঠিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক সচেতন জনতা সমৃদ্ধ ঘাঁটি এলাকার অভাবে। সুতরাং কেবল মাত্র অসংগঠিত বিশাল জনতা ও অস্ত্রই দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র নির্ধারক নয়, সামগ্রিক বিজয়ের জন্য সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ জনতা এবং তাঁদের পরিচালনায় সক্ষম সঠিক রাজনীতি সম্বলিত ঐ মেহনতী জনগণের একটি বিপ্লবী পার্টি নেতৃত্ব অপরিহার্য। এই কারণেই বর্তমানে অস্ত্রের প্রতি অতি মাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে অসংগঠিত ব্যাপক জনতাকে সঠিক রাজনৈতিক পথে সংগঠিত করে বিভিন্ন এলাকায় এই সচেতন জনতার সহয়তায় ঘাঁটি এলাকার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের দিকেই আমাদের অধিক মনোযোগী হতে হবে। এই ঘাঁটি এলাকাতেই অত্যন্ত গোপনে অস্ত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, ঘাঁটি এলাকা ছাড়া গেরিলাদের অবস্থান বিশ্রাম পরিকল্পনা ও অস্ত্র সংরক্ষণ অর্থাৎ সামগ্রিক গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা কষ্টকর হয়ে পড়বে, মুক্তিযুদ্ধ হবে বিলম্বিত। সুতরাং এই সাংগঠনিক দায়িত্ব বিপ্লবের স্বার্থে, বিপ্লবী জনতার স্বার্থে এবং যুদ্ধে বিজয় লাভের স্বার্থে প্রতিটি গেরিলাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাথমিক ও আশু কর্তব্য হিসাবে এই মুহূর্ত থেকেই সম্পাদন করতে হবে।

গেরিলা চাতুর্য ঃ ওয়ার অব এ্যাট্রিশন অর্থাৎ শত্রুর মনোবলকে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত করে তার যুদ্ধক্ষমতা নিঃশেষ করে দেওয়াই গেরিলার যুদ্ধধর্ম। এর জন্য বিবিধ ধরণের গেরিলা চাতুর্যের আশ্রয় নিতে হয়। শত্রু অবশ্যই গেরিলা সৈন্যকে রেহাই দেবে না। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ, বিশেষতঃ গেরিলা অধ্যুষিত এলাকায়, গেরিলাদের পক্ষে বিজয় লাভের সুবর্ণ সুযোগ। শত্রুকে আক্রমণের উৎসাহে দুর্গম অঞ্চলের ভিতরে টেনে এনে, এবং সেখানে চতুর্দিক থেকে পাল্টা আক্রমণ, কিংবা তাদের সকল সরবরাহ পথ বন্ধ করে দিয়ে শত্রুর ব্যূহের পাশ থেকে খাব্‌লে খাব্‌লে উপর্যুপরি আক্রমণ চালানো এবং শত্রুর সেনা খতম করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেওয়াই হচ্ছে গেরিলাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট চাতুর্যপূর্ণ কাজ।

এর জন্য প্রথম থেকেই দেখা দরকার শত্রুর সেনাবল কত, তার নেতৃত্ব কতখানি কার্যকরী, তার গুপ্তচর দালালশ্রেণী কতটা তৎপর; শত্রু সেনার গতিবেগ কত এবং তাদের অস্ত্রের পরিমাণ, ধরণ ও মৌলিক গুণাগুণ (রেঞ্জ—অর্থাৎ গুলি কতদূর পর্যন্ত মোক্ষম আঘাত করতে সক্ষম; ফায়ার পাওয়ার—অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলি মিনিটে কয় রাউণ্ড গুলি ছুঁড়তে সক্ষম

ইত্যাদি) সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। গেরিলা চাতুর্য প্রয়োগে এ সকল তথ্য কার্যকরী সহায়তা করে থাকে।

গেরিলা যুদ্ধ-লক্ষ্যের কৌশলগত ব্যবহারিক প্রয়োগই এই যুদ্ধ প্রণালীর চাতুর্য। লক্ষ্যের পরিবর্তন না হলেও কৌশলের ব্যবহার প্রণালী পরিবর্তিত হয় এবং তা যুদ্ধের মুহূর্তিক প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

দ্রুত সঞ্চরণ ক্ষমতা গেরিলাদের প্রধান যুদ্ধগুণ ও কৌশল। গতিই হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধের প্রাণ। প্রতিকূল যুদ্ধাবস্থায় কৌশলগত পলায়ন, নিজেদের রসদপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের অপসারণ ও স্থানান্তরকরণ, শত্রুর হাতে ঘেরাও হওয়ার অবস্থা থেকে নিজেদের বের করে নেওয়া এবং পরবর্তী সময়ে শত্রুকেই পাল্টা ঘেরাও করা, যুদ্ধকে বিভিন্ন স্তরে ওঠানো এ সমস্তই গেরিলা যুদ্ধ প্রণালীর অংশ।

সাবোটেজ বা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ : গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম দামী হাতিয়ার হচ্ছে সাবোটেজ বা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ। বিপ্লবী গেরিলাদের নিয়ন্ত্রিত ঘাঁটি এলাকার বাইরে শত্রু অধিকৃত এলাকায় শত্রুর সকল সংযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করাই এর প্রধান লক্ষ্য। শত্রু অধিকৃত বেতার, টেলিফোন, বিদ্যুৎ সরবরাহের থাম, বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র, জলাধার, পেট্রোল, যানবাহন ও তার ঘাঁটি, যোগাযোগ পথ, পথের সেতু, রেল লাইন, রেলইঞ্জিন, জাহাজ নৌকা, অস্ত্রের গুদাম খাদ্য ও রসদের গুদাম ইত্যাদি ধ্বংস করা খুবই জরুরী। এ প্রচেষ্টা হবে সুপরিকল্পিত ও ঘন ঘন। এতে দু ধরনের লাভ হবে। প্রথমতঃ শত্রুর কবলিত এলাকার উৎপাদন, যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যাহত হবে, শত্রুর মনোবল ভেঙ্গে যাবে এবং তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ শত্রু অধ্যুষিত এলাকার চতুষ্পার্শ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করতে পারলে শত্রুমুক্ত এলাকায় গেরিলারা তাদের সকল কার্যে পূর্ণ উদ্যম সহকারে তৎপর হয়ে উঠতে পারবে, হঠাৎ করে সেখানে শত্রুর আগমনে ধ্বংসলীলা ঘটবে না।

এই অন্তর্ঘাতমূলক কাজের জন্য মাইন, ফাঁদপাতা বোমা (Boobytrap) মলোটেভ, ডিনামাইট, প্লাস্টিক, পেট্রোল, গেসেলিন, টি-এন-টি, গান পাউডার ও অন্যান্য বিস্ফোরক ও রাসায়ণিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক বেটারী ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহারে সক্ষম বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত যোদ্ধার প্রয়োজন। এ ছাড়াও এ ধরণের কাজে নিয়োজিত অসীম সাহসী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী ক্যমাণ্ডো গেরিলা সহজলভ্য পারিপার্শ্বিক

উৎপাদনের সাহায্যে, শত্রুকে ধোঁকা দিয়ে অনেক ধ্বংস কার্য এমন কি শত্রু হননের কার্যও যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারে। সাপুড়ের বেশে শত্রুর শিবিরে বিষাক্ত সর্প নিক্ষেপ, মিত্রবেশে শত্রু শিবিরে ঢুকে অভিনয়ের মাধ্যমে তাদের আস্থা অর্জন করে সময় ও সুযোগ বুঝে তাদের বিভিন্ন রসদের ধ্বংস, পানীয় জলে বিষ প্রয়োগ, পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফুটা করা বা তাতে আগুন লাগানো, বিভিন্ন গাড়ির পার্টস অপহরণ এমন কি শত্রুদের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য দ্রব্যে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমেও এ ধরণের অন্তর্ঘাত-মূলক ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পন্ন করা যায়। এ সকল কাজ দিবালোকের চেয়ে রাতের আঁধারে সম্পন্ন করাই অধিকতর সুবিধাজনক। বস্তুতঃ সরাসরি যোদ্ধার চেয়ে এ সকল কাজে বিশেষ কম্যাণ্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিচক্ষণ ও অসীম সাহসী কর্মী এবং নেতার প্রয়োজন।

প্ররোচনা প্রলোভনমূলক কাজ ও ঘেরাও আক্রমণ : প্ররোচনা ও প্রলোভনমূলক কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রু সেনাকে তার অবস্থান থেকে অপেক্ষাকৃত অসুবিধাজনক ও দুর্ভেদ্য দুর্গম বা ফাঁদ পাতা জায়গায় সরিয়ে আনা এবং পরিকল্পনা অনুসারে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে উপর্যুপরি গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে তাদের খতম করা। এক্ষেত্রে ল্যাণ্ড মাইন ডিনামাইট ফিউজ চালিত বিস্ফোরক ব্যবহার করে শত্রু নিধন আরো সহজতর। এতে বিবিধ ধরণের সুবিধা—গেরিলারা স্থানীয় সুপরিচিত ভৌগোলিক সুবিধাকে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগাতে পারে, স্থানীয় সুবিধা অনুসারে পরিকল্পনানুসারে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে। পক্ষান্তরে শত্রুসেনা ঐ স্থানীয় এলাকা, ঐ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ফাঁদ ও গেরিলাদের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকায় অপরিকল্পিত ভাবে অনির্দিষ্টভাবে চতুর্দিকে ক্রমাগত গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে। এই ক্রমাগত লক্ষ্যণীয় গোলাবর্ষণ নিজেদের হৃত মনোবল ও সাহস ফিরিয়ে আনার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। শত্রু যখন এমন অবস্থায় পতিত হয় তখন প্রতিটি গেরিলাকে বুঝতে হবে যে গেরিলা আক্রান্ত হয়ে শত্রু অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত দিশেহারা এবং বিব্রত অবস্থায় আছে। তাদের মনোবল ও সাহসের ঘটেছে বিলুপ্তি এবং সেই হৃত মনোবল ও সাহস ফিরিয়ে এনে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায়ই তারা ক্রমাগত লক্ষ্যহীন ভাবে গোলাবর্ষণ করে চলছে। এতে তাদের গোলাগুলির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হবে এবং তা হবে সম্পূর্ণ অযথা ও অপ্রয়োজনীয়। এমতাবস্থায় গেরিলাদের

গোলাগুলি খরচ করার কোন আবশ্যকীয় প্রয়োজন নেই (গেরিলাদের প্রতিটি বুলেটের মূল্য অনেক, তাদের প্রতিটি বুলেট সঠিক লক্ষ্যভেদ করা প্রয়োজন)। বরং শত্রুপক্ষের গোলাগুলি সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কখনো ডান, কখনো বাম, কখনো বা সম্মুখ কখনো বা পশ্চাৎদেশ থেকে দু একটি গুলি ছুঁড়লেই আবার শত্রুসেনা শুরু করবে প্রবল গোলাবর্ষণ। এভাবে চতুর্দিকের আক্রমণে অতি সহজেই শত্রুকে হতবল-শ্রান্ত-বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত করা যায়। এই অবস্থায় শত্রুকে নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখা ও বিশেষ কারণ ব্যতীত ঐ স্থান ত্যাগ না করতে দেওয়া জয়লাভের পক্ষে আর একটি অন্যতম গেরিলা কৌশল। শত্রুসৈন্য কোনদিকে অগ্রসর হতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিক বা পশ্চাৎদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। ফলে চতুর্দিকের আক্রমণে দিশাহারা শত্রুসেনাকে সহজেই কাবু করা যাবে। শত্রু যদি ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায় (যা তারা দিশাহারা অবস্থায় করে থাকে) তাহলে গেরিলাদের আরো সুবিধা। শত্রুশক্তি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে এবং অপরিচিত স্থানে তারা অবশ্যই সমূহ অসুবিধা ও ফাঁদে পড়বে, এমতাবস্থায় শত্রু নিধন আরো সহজতর।

শত্রুর এই ক্রমাগত এলোপাথারী গোলাবর্ষণের ফলে গেরিলাদের আর একটি সুবিধা হবে শত্রু মিত্র নির্ধারণ করার ব্যাপারে। যুদ্ধরত গেরিলাদের সাহায্যকারী নূতন আগত গেরিলারা গোলাগুলির শব্দেই বুঝতে পারবেন কোথায় শত্রুসৈন্য ও কোথায় মিত্র সৈন্য অবস্থান করছে। এবং কোনপথে নিজেদের সেনাদের সঙ্গ লাভ করা যাবে। যেদিক থেকে প্রচণ্ড গোলা বর্ষিত হচ্ছে তা হচ্ছে শত্রুসেনার অবস্থান স্থল। নবাগত গেরিলাদের সেদিক পরিত্যাজ্য। যেদিক বা যেসকল দিক থেকে টুকটাক দু একটি গোলা বর্ষিত হচ্ছে সে সব স্থানে অবস্থান করছে অন্যান্য গেরিলা বন্ধুরা। নবাগতরা সেদিকে এগিয়ে যাবে এবং যুদ্ধরত বন্ধুদের শক্তিবৃদ্ধি করবে। শত্রুর অবিরাম গোলা এভাবেই গেরিলাদেরকে সঠিক পথে মিত্র শক্তির নিকট পৌঁছতে সাহায্য করে থাকে।

মাঝে মাঝে শত্রুসেনা গেরিলা বাহিনীর এক একটি ইউনিটকে ঘিরে ফেলতে চাইবে। তেমন অবস্থায় অন্যান্য ইউনিটের নিকট সঙ্কেত প্রেরণ ও সেই সঙ্কেত অনুসারে অন্যান্য গেরিলা ইউনিটের কর্মতৎপরতা

গেরিলাদের আত্মরক্ষার রণনীতির গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল। অন্যান্য ইউনিটকে তখন সেই শত্রু সৈন্যকে পাল্টা ঘেরাও করে ক্রমাগত ও উপর্যুপরি চতুর্দিক থেকে ঘন ঘন আক্রমণ চালাতে হবে। সর্বদা দিশেহারা অবস্থায় রাখতে হবে। এমন অবস্থায় শত্রুসেনাকে আক্রমণাত্মক উদ্যোগ নিতে দেওয়া কোনক্রমেই সঠিক হবেনা, বরং আক্রান্ত অবস্থায়ই তাদেরকে আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত রাখতে হবে যে পর্যন্ত না ভিতর ও বাইরের গেরিলাদের দ্বারা সম্পূর্ণ শত্রু সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হবে অথবা ভিতরে আটকা পড়া গেরিলা ইউনিটটি শত্রু বুহ্য ভেদ করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। মনে রাখতে হবে আক্রমণই হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ বিজয়ের সুনিশ্চিত ও পরীক্ষিত পথ।

শত্রু অধ্যুষিত এলাকায়ও এই ঘেরাও পদ্ধতির যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব। তবে এই আক্রমণ যতদূর সম্ভব রাতের আঁধারেই সম্পন্ন করা উচিত। এই আক্রমণ একটি বিশেষ কায়দায় পরিচালনা করা যেতে পারে যাকে গেরিলা মিনুয়েট ডান্স বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে গেরিলারা ৪টি কিংবা ৫টি ইউনিটে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। প্রত্যেক ইউনিটে ৫ থেকে ৯ জন গেরিলা অংশ গ্রহণ করে। প্রথমে একটি ইউনিট শত্রু সৈন্যকে আক্রমণ করে এবং শত্রুসৈন্যকে সেই ইউনিটকে পশ্চাদ্ধাবন করা অবস্থায় এগুতে দেওয়া হয়। এদিকে গেরিলাদের অন্যান্য ইউনিটগুলি শত্রু-সেনাদের উভয় পার্শ্বে এবং পেছনে পেছনে অগ্রসর হতে থাকে। শত্রুকে তার এলাকার বাইরে এনে প্রথম দল নিবিড় ভাবে শত্রুর ওপর কিছুক্ষণ গুলি বর্ষণ করে এবং দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। শত্রুও গুলিবর্ষণ করতে করতে এগুতে থাকে। এইবার পেছনের ইউনিট পেছন থেকে অগ্রসরমান শত্রুকে আক্রমণ করে এবং শত্রুসৈন্য দলকে আর একদিকে টেনে আনে। এইবার পার্শ্বদেশের ইউনিটগুলো একযোগে শত্রুদের উপর চালায় আক্রমণ ; সেই সঙ্গে সম্মুখ এবং পশ্চাত থেকেও। ফলে চতুর্দিক থেকে যুদ্ধের দাবী আসায় শত্রুরা প্রভূত গুলি কার্তুজ খরচ করতে বাধ্য হয়। এবং চারিদিক থেকে গেরিলা সৈন্যের যুযুধান উপস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে শ্রান্ত, বিভ্রান্ত, অবসন্ন এবং হৃত মনোবল হয়ে পড়ে। পরে অবস্থা বুঝে সারা শত্রু দলটিকে একত্রে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

এই মিনুয়েট ডান্স পদ্ধতির গেরিলা আক্রমণ রাত্রিকালেই বেশি কার্যকরী হয়। কারণ প্রয়োজনবোধে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়ে

যাবার পর সংঘর্ষে বিরতি এনে শত্রুপক্ষকে না জানতে দিয়েই রাতেই পশ্চাদপসারণ সুসাধ্য। সাধারণভাবে গেরিলাদের চলাফেরায় রাতের অন্ধকার শত্রুর নজর এড়াতে সহায়তা করে।

পূর্ব বাংলা নদীমাতৃক ঘন গাছপালা ঝোপঝাড় সমৃদ্ধ দেশ। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে সহজেই গেরিলা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতে হবে। হানাদার শত্রু সেনারা প্রায় সবাই মরু ও পর্বতময় অঞ্চলের অধিবাসী। তারা পূর্ব বাংলার কর্দমাক্ত ও গভীর জলপথে চলতে অনভ্যস্ত। এই প্রাকৃতিক সুযোগ আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। প্ররোচনামূলক কাজের দ্বারা নদী খাল বা বিলের পাড়ে এনে তিন দিক থেকে আক্রমণ করে শত্রুদের জলাশয়ে নামতে বাধ্য করা এবং সেই জলাশয়েই সহজতর উপায়ে তাদের খতম করা অন্যতম গেরিলা কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে জলাভূমিপূর্ণ এলাকায় নৌকার ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া, অপ্রয়োজনীয় নৌকা ডুবিয়ে রাখা এবং প্রয়োজনীয় নৌকা যথাসম্ভব গোপন রাখা কিংবা সাময়িক ভাবে ডুবিয়ে রাখা প্রয়োজন যাতে জলপথে পারাপারের জন্য শত্রু তা ব্যবহার করতে না পারে। নৌকাযোগে শত্রু আক্রমণ করলে শত্রুকে পাড়ে না উঠতে দেওয়াই হবে গেরিলাযুদ্ধ সম্মত কাজ। কারণ জলাশয়কে শত্রুর ভীষণ ভয়, জলাশয়ে এমনিতেই তারা আতঙ্কগ্রস্ত এবং হৃত মনোবল অবস্থায় থাকে। জলাশয়ে তাদের উপর গেরিলা আক্রমণ তাদেরকে আরো দিশাহারা হতাশাগ্রস্ত আতঙ্কিত এবং বিপন্ন করে তোলে। এমতাবস্থায় শত্রু যত শক্তিশালীই হউক না কেন—পরাজিত করা অনেক সহজ। কোন ক্রমে নৌকা ডুবিয়ে দিতে পারলে অস্ত্রচালনার সময়ও তারা পাবেনা, সেখানেই ঘটবে সলিল সমাধি; ধ্বংস হবে শত্রুরা।

সাধারণ যুদ্ধরীতি থেকে গেরিলাদের যুদ্ধরীতি অনেক স্বতন্ত্র। রণ-কৌশল পদ্ধতি সংক্রান্ত নূতন নূতন চাতুর্য্যকলা আবিষ্কার করা গেরিলাদের কাজ। সাধারণতঃ সৈনিকদের সকল সময়ই তার নিকটস্থ উচ্চ পদাধি-কারীর কাছ থেকে হুকুম নিতে হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে গেরিলাদের স্বাধীনতা রয়েছে। যুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের জন্য উপযুক্ত কলাকৌশল সে নিজেই স্থির করবে এবং প্রতি মুহূর্তে শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণে বিমূঢ় করে দেওয়াই তার কাজ।

সরাসরি সংঘর্ষ ও তার প্রস্তুতিঃ সাধারণতঃ শত্রুর টহলদার বাহিনী,

আক্রমণকারী শত্রুর দল বা গাড়ী, বিচ্ছিন্ন দল বা ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাতে সহজে ও গোপনে বহনযোগ্য হাল্কা অস্ত্রই (small arms) গেরিলাদের উপযোগী। সাধারণ বন্দুক, রাইফেল, আধা বা পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় (Automatic) স্টেন গান, L. M. G, সাব মেশিন গান, হাতবোমা (Hand Grenade) দুই বা তিন ইঞ্চি মর্টার ইত্যাদি ব্যবহার্য। এমন কি বিশেষতঃ প্রথমস্তরে উপরোক্ত অস্ত্রের সঙ্গে তীর ধনুক বল্লম, দা তরবারী, ছোরা, টাঙ্গীও ব্যবহার করা যেতে পারে (বিশেষতঃ শত্রুদের স্থানীয় সহযোগীদের ক্ষেত্রে)। অতঃপর শত্রুর নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র ও গোলাগুলিই গেরিলাদের যুদ্ধের প্রধান অবলম্বন। এক একটি মূল গেরিলা ইউনিট ৫ থেকে ১১ জন গেরিলার সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে, তার বেশী নয়। সংখ্যায় গেরিলার উপস্থিতি বেশী থাকলে বেশি ইউনিট বানানো যেতে পারে কিন্তু এক ইউনিটে গেরিলা সংখ্যা বেশি হলে গেরিলা কাজকর্মের অসুবিধাই হয়। রণকৌশলগত ভাবে এক ইউনিটের নির্দেশ পরিকল্পনা ও কার্যসূচী অন্য ইউনিট বা ইউনিটসমূহের না জানাই ভাল তবে যৌথ আক্রমণের সময় বিভিন্ন সঙ্কেত, আক্রমণের ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ইউনিট প্রধানদের সম্মিলিতভাবে আলোচনা করা এবং সঠিক পরিকল্পনা নির্ধারণ করে নেওয়াই ঠিক, কিন্তু মূল আলোচনা ইউনিট প্রধানকে সর্বদাই গোপন রাখতে হবে। যুদ্ধের পূর্বে সে তার ইউনিটের অন্যান্য গেরিলাদের শুধুমাত্র নিজ দায়িত্বই বুঝিয়ে দেবে। তবে সংঘর্ষ চলাকালীন অবস্থায় প্রয়োজন বোধে ইউনিট প্রধান মূল আলোচনা সম্পর্কে নিজ নিজ ইউনিটকে অবহিত, সতর্ক করতে ও উপদেশ দিতে পারে। এই ব্যবস্থা সতর্কতা মূলক; যাতে শত্রুপক্ষের নিকট কোন পরিকল্পনা বা সংবাদ যুদ্ধের পূর্বে না পৌঁছাতে পারে। আক্রমণের পূর্বে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ সংবাদ ও গুপ্ত তথ্য গেরিলা যোগাযোগ ব্যবস্থা, আক্রমণের পরিকল্পনা ও ধারা যতদূর সম্ভব নিখুঁত হওয়া চাই। অস্ত্র ও সাজ সরঞ্জামের যথাযথ কার্যকারিতা আক্রমণের পূর্বে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। আহতদের বহন নিহতদের অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ এবং শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি ও সাজসরঞ্জামাদি দ্রুত অপসারণ করার মত লোক মজুদ থাকা প্রয়োজন। লড়াইএর পর অস্ত্রশস্ত্র যথাযথ পরীক্ষা ও পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

গেরিলাদের সংখ্যাল্পতার দরুণ তাদেরকে এমন সংঘর্ষ এড়াতে হবে যেখানে শত্রুর হতাহতের সংখ্যা গেরিলাদের হতাহতের অপেক্ষা বেশী

হবে না। সমান সমান হতাহতও গেরিলাদের জন্য বিপজ্জনক ; কারণ সুশিক্ষিত দক্ষ রাজনৈতিক সচেতন গেরিলা সৈন্য চট করে তৈরী করা যায় না। মনে রাখতে হবে প্রতিটি রাজনৈতিক সচেতন গেরিলা হচ্ছে জনগণের মূল্যবান সম্পদ—তাদের অগ্রবাহিনী, দেশের মহামূল্য রত্ন বিশেষ। একটি গেরিলা হারানোর অর্থই হচ্ছে দেশের ও জনগণের অপূরণীয় একটি ক্ষতি। তাই এ সমস্যাকে রণকৌশলেরই একটি সমস্যা হিসাবে দেখতে হবে।

মুক্তাঞ্চল : গেরিলা বাহিনীর দখলীকৃত ও রাজনৈতিক সচেতন ঐক্যবদ্ধ জনগণের নিয়ন্ত্রিত যে এলাকা তাকেই সাধারণ কথায় মুক্তাঞ্চল বলা হয়ে থাকে। এই মুক্তাঞ্চলগুলিতেই গেরিলারা সশস্ত্রভাবে অবস্থান করে এবং শত্রু-পক্ষকে ঘায়েল করার প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। এই মুক্তাঞ্চলকে প্রাথমিক পর্যায়ে খুবই গোপনীয় করে রাখতে হবে। নচেৎ শত্রুপক্ষ অঙ্কুরেই এই অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করে দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে ঐ স্থানের ব্যাপক জনগণকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি রাজনৈতিক সচেতন ও সংগঠিত করে তোলার দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পণ করে। প্রায় প্রতিটি মুক্তাঞ্চলেই প্রাথমিক অবস্থায় দেখা গেছে একশ্রেণীর স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোক গেরিলাদের কাজকর্মে প্রবল বাধার সৃষ্টিকরে এবং শত্রুদের সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতা করে। নিজদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে এরা নিজ এলাকার জনগণকেই ঠেলে দেয় শত্রুদের তীব্র অত্যাচারের মুখে, এমনকি নিজেরাও শত্রুদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থানীয় জনগণকে হত্যা করে তাদের সম্পত্তি লুট করে অগ্নিসংযোগ করে এবং নারীদের উপর চালায় পাশবিক অত্যাচার। সেনাবাহিনীর রাজাকার হিসাবেই এরা পরিচিত। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে—প্রতিটি রাজাকার স্থানীয় সামন্ত শোষণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের পরিচালক গোষ্ঠী হচ্ছে স্থানীয় সামন্ত শোষক অত্যাচারী জোতদার, সুদখোর মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার, মজুতদার, চোরাকারবারী, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মেম্বার, চৌকিদার দফাদার বদমাতব্বর ও তাদের তাঁবেদার দালাল বাহিনী। এরাই যুগ যুগ ধরে জনগণের উপর চালিয়ে আসছে প্রচণ্ড সামন্তবাদী শোষণ, যে শোষণে জর্জরিত পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজ তথা পূর্ব বাংলার ৮৫ ভাগ জনগণ। এই ঘৃণ্য সামন্ত শোষক শ্রেণী, পাকিস্তানী ঔপনিবেশ-শাসক-শোষক শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীই একযোগ

শোষণ নিপীড়ন ও বঞ্চনার দ্বারা পূর্ব বাংলার জনগণকে এক সর্বহারা জাতিতে পরিণত করেছে। এরা পরস্পরের মিত্র জনগণের শত্রু। এবং রূপ ভিন্ন হওয়া সত্বেও শোষণের ক্ষেত্রেও এরা এক এবং অভিন্ন। আজ এদের যে কোন একটিকে আঘাত করলে শ্রেণীমিত্রতার কারণেই এরা একে অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। পূর্ব বাংলার জনগণ যে মুহূর্তে পাকিস্তানী ঔপনিবেশক শ্রেণী ও তার হানাদার বাহিনীকে আক্রমণ করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই দেশীয় সামন্ত শোষকরা নিজস্বার্থে তাদের শ্রেণীমিত্র পাকিস্তানী শোষক শাসকদের পক্ষাবলম্বন করেছে। এমতাবস্থায় এই স্থানীয় শোষক শত্রুদের বাঁচিয়ে রেখে কোন ক্রমেই ঘাঁটি এলাকা বা মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তবে কৌশলগতভাবে প্রথমেই এদের খতম করা ঠিক হবে না। প্রথমে গোপনে ঐ এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক রাজনীতি প্রচার করতে হবে। এই অবস্থায় যে সকল সামন্ত গেরিলাদের বাধা দিতে আসবে শুধুমাত্র তাদের নেতৃস্থানীয় দু-একজনকে খতম করাই হবে গেরিলাদের আশু কাজ। ফলে অন্যান্য সামন্ত জোতদার ও তাদের দালাল বাহিনীতে দেখা দেবে দারুন সন্ত্রাস। এই অবস্থায় সবাইকে একযোগে খতম না করে, বরং ডেকে এনে সতর্ক করে দিয়ে রাজনৈতিক ভাবে বক্তব্য দিয়ে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ করতে বলা হবে। অন্ততঃ কোন জোতদার মহাজন যদি বিপ্লবী গেরিলাদের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার আবশ্যকীয় কোন প্রয়োজন নেই, বরং তার নিকট থেকে জরিমানা স্বরূপ অপ্রয়োজনী জমি ছিনিয়ে নিয়ে ভূমিহীন গরীব চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। এ কাজ যথাসম্ভব সচেতন স্থানীয় জনতার গণ আদালতেই করা শ্রেয়। এমন কি জমি ছিনিয়ে আনার পরেও তাকে জনগণের পক্ষে পেতে চেষ্টা চালাতে হবে; রাজনীতিগত ভাবে ধৈর্য সহকারে প্রতিটি গেরিলাকে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে, আবেগে পরিচালিত হলে চলবে না। ভূমিহীন-গরীব কৃষকদের মধ্যে এভাবে জমি বণ্টন করে দিয়েই ব্যাপক ভূমিহীন ও গরীব কৃষককে গেরিলাদের স্বপক্ষে, বিপ্লবের স্বপক্ষে আনত হবে; কারণ ভূমিহীন গরীব কৃষকই পূর্ব বাংলার এই মুক্তি যুদ্ধের মূল শক্তি। অবশ্যই এ কাজে পূর্ব থেকে যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে—যাতে কেউ শত্রু সেনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। প্রয়োজন বোধে সমস্ত গ্রাম স্থানীয় জনগণের সহয়তায় ঘেরাও করে রাখতে হবে যাতে

কোন জোতদার মহাজন বা তাদের কোন চিহ্নিত দালাল সংবাদবাহী গ্রামের বাইরে না যেতে পারে। এ কাজে ছোট ছোট বালক বালিকাদের ট্রেনিং দিয়ে গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োজিত করা যেতে পারে যাতে তাদের যে কোন দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপ সম্বন্ধে তথ্য জানা যায়। যে কোন শ্রেণীর লোক রাজনৈতিক ভাবে বুঝাবার পরেও যদি শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টা করে, শত্রুর নিকট সংবাদ পাঠাবার চেষ্টা করে, শত্রুর পক্ষ নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে কোন কুকর্মে লিপ্ত হয়, কিংবা বিপ্লবী গেরিলাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রয়াস পায় তবে তাকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যাবে না। গণআদালতে তার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া যাবে। গণআদালত বসাবার উপযুক্ত পরিস্থিতি না থাকলে গুপ্তভাবেই তাকে খতম করতে হবে, তবে গণআদালতে বিচার করে দণ্ড দেয়াই হবে মুখ্য লক্ষ্য। এই খতমের পর স্থানীয় জনগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু প্রতিটি গেরিলাকে এই খতমের তাৎপর্য সম্পর্কে অসীম ধৈর্য সহকারেই জনগণের নিকট ব্যাখ্যা তুলে ধরতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের লক্ষ্য কোন ক্রমেই ব্যক্তিহত্যা বা সন্ত্রাসবাদ নয়, একমাত্র শত্রুকেই বিচারের মানদণ্ডে দণ্ডিত করা আমাদের লক্ষ্য। অযথা রক্তপাত আমরা চাইনা, তবে বৃহত্তর রক্তপাত বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রতর রক্তপাত আমাদের করতেই হবে, যে দায়িত্ব শত্রুই স্বেচ্ছায় আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

এভাবেই একযোগে দেশীয় সামন্তবাদী শোষক, পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক এবং সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিক শোষকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে পূর্ব বাংলায় বিপ্লবী জনগণের আপোষহীন দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠিত হবে মুক্ত এলাকা, গণযুদ্ধের মাধ্যমে যা আরো সম্প্রসারিত হবে, শত্রুকে কোণঠাসা করবে শহরের বুকে তারপর গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে একটি একটি করে নেবে সমগ্র শহর, শত্রু-মুক্ত হবে সমগ্র দেশ; প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন পূর্ব বাংলা। সুতরাং প্রতিটি মুক্তাঞ্চল সমগ্র মুক্ত দেশেরই এক একটি মুক্ত ইউনিট বিশেষ। তাই আগামীদিনের রূপরেখার পত্তন মুক্তাঞ্চলগুলিতে অবশ্যই থাকতে হবে।

(১) স্থানীয় সাংগঠনিক নেতৃত্ব : গেরিলা ইউনিট সহ স্থানীয় সকল বিভাগের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব এদের হাতেই ন্যস্ত। এঁদের সবাই

হবেন সর্বহারা রাজনৈতিক পার্টির কেন্দ্রীয় বা জেলা নেতৃত্বাধীন। এঁরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারার সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই স্থানীয় জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে তুলবেন। এঁরা নিজেরাও গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে নেতৃত্ব দেবেন। গেরিলাদেরকে আরো রাজনৈতিক সচেতন করে তোলা ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে তোলা এঁদেরই পবিত্রতম দায়িত্ব এবং আবশ্যকীয় কর্তব্য। বিভিন্ন আক্রমণের মুখে জনগণের মনোবলকে দৃঢ় অটুট রাখার দায়িত্বও এঁদের উপর ন্যাস্ত। রাজনৈতিক তাবে এলাকার সম্প্রসারণ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও অন্যান্য মুক্তাঞ্চলের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে যোগাযোগ রক্ষায় দায়িত্ব একমাত্র এরাই পালন করবেন। স্থানীয় কৃষি, শিল্প প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টা এদেরকেই কঠোর পরিশ্রম, সমূহ আত্মত্যাগ ও সেবা করার দৃঢ় মনোবৃত্তির মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে হবে। এক কথায় ঐ এলাকায় জনগণের পক্ষ থেকে তাদেরই হাতে থাকবে সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা।

(২) **স্থানীয় সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী :** মহান মাও বলেছেন "গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকে না।" এই মূল্যবান উপদেশকে সামনে রেখেই স্থানীয় জনগণের নিজস্ব গেরিলা বাহিনী রাজনৈতিক ও সামরিক ট্রেনিং-এর মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। জনগণের সেবা করার মনোবৃত্তিকে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তাঁদের মধ্যে জন্মাতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাঁরা আরো রণঅভিজ্ঞ, আরো উন্নততর, আরো সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। এরাই হবে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত লালফৌজ। একমাত্র রণক্ষেত্রের কৌশল ছাড়া অন্য সকল প্রশাসনিক ব্যাপারে এঁরা স্থানীয় সাংগঠনিক নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হবে।

(৩) **অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অস্ত্রাদি নির্মাণ কারখানা :** গেরিলারা অস্ত্রশস্ত্র এবং শত্রুরা যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করে সেসকল অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে প্রতিটি গেরিলাকে অবশ্যই অন্তত: সাধারণ জ্ঞান রাখতে হবে। এবং প্রতিটি মুক্তাঞ্চলেই সেই অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অতি গোপনে সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া প্রতিটি গেরিলা কেন্দ্রেই বিকল অস্ত্রশস্ত্র মেরামত করার মত প্রয়োজনীয় কারখানা থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি মুক্তাঞ্চলে পাইপ গান, দেশী বন্দুক, পিস্তল, বল্লম, বড় ছোরা, নানা ধরণের বিস্ফোরক, হাতবোমা, মলোটভ ককটেল, ফিউজ, কার্তুজ রাখার বেল্ট,

দেশী বন্দুকের টোটা ইত্যাদি প্রস্তুত করার মত কারখানা থাকলে ভাল হয়। তবে এগুলো যুদ্ধকালে নির্ভরযোগ্য মনে করা ভুল (প্রয়োজন মেটায় মাত্র); কেননা শত্রুর ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র অনেক উন্নত মানের এবং গেরিলাকে ঐ ধরণের অস্ত্রশস্ত্র এই সকল দেশীয় অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমেই দখল করে নিতে হবে।

(৪) **প্রচার ব্যবস্থা :** গেরিলা যুদ্ধে প্রচারের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রচার ব্যবস্থা দু ধরণের হবে—(এক) সমগ্র জাতি ও গেরিলাদের জন্য খোলাখুলি প্রচার এবং (দুই) গোপন প্রচার : গেরিলাদের মধ্যে রণনীতি রণকৌশলের প্রচার ও জনগণের মধ্যে সাংগঠনিক প্রচার। প্রথম ধরনের প্রচারের জন্য সাময়িক পত্র-পত্রিকা, গুপ্ত রেডিও, বিশেষ ইস্তেহার বা বুলেটিন যাতে যুদ্ধের অবস্থার সংবাদ, শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী-কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সংবাদ, শত্রুদের বিভিন্ন আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার বিভিন্ন নির্দেশ, সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিপ্লবী যোদ্ধাদের আদর্শ ও লক্ষ্য প্রচার উল্লেখযোগ্য। শত্রু সৈনিকদের নিকটেও যেন এ সংবাদ পৌঁছায়, কিন্তু কোথা থেকে এবং কে প্রচার করছে তা অবশ্য গোপন রাখতে হবে। এটাও একটা গেরিলা প্রচার কৌশল। দ্বিতীয় ধরণের প্রচার দু ধরণের গেরিলাদের জন্য গোপন প্রচারের বিষয় হবে স্যাবোটাজ ও অপরাপর যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের প্ল্যান, অত্যাচারী শোষক-শাসকদের ঘৃণিত অপরাধ (শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিতে) এবং সমাজজীবনে অপরাধের ভূমিকা, বৈদেশিক সংবাদ (বিশেষতঃ বিশ্ব বিপ্লবের বিভিন্ন সংবাদ যার সঙ্গে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সাদৃশ্য এবং সম্পর্ক আছে) ও অন্যান্য নির্দেশাবলী। এ সংবাদ প্রেরিত হবে গোপন সার্কুলার বা গোপন পত্রিকার মারফত, এমনকি চিঠি-পত্রের মাধ্যমেও করা যেতে পারে। স্থানীয় জনগণের জন্য প্রচার মূলতঃ জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা ও সংগঠিত করা এবং যুদ্ধাবস্থায় জনগণের মনোবলকে সুদৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত। একাজে স্থানীয় গেরিলা প্রচার ইউনিটই সবচেয়ে কার্যকরী। একই সঙ্গে সকল স্থানীয় গেরিলাকে হয়তো সশস্ত্র করা বা অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে না। তাই পালাক্রমে বিভিন্ন গেরিলা ইউনিটকে প্রচার কার্যে নেমে পড়তে হবে। এ প্রচার সাধারণতঃ মুখে মুখেই করা উচিত। এতে গেরিলাদের সঙ্গে সরাসরি জনগণের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং জনগণ ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক সচেতন হয়ে গেরিলাদিগকে তাঁদেরই আপনজন

হিসাবে মনে করতে থাকবে। এভাবে গেরিলাদের সঙ্গে জনগণের এবং জনগণের সঙ্গে গেরিলাদের সম্পর্ক নিকটতর হবে নিবিড় হবে। জনতা থেকে স্বেচ্ছায় গেরিলাকর্মী বেরিয়ে আসতে থাকবে যা ঐ স্থানীয় জনগণ ও রাজনৈতিক সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। এই সকল প্রচারের অন্যতম মূল রাজনৈতিক বিষয় হবে জনগণ ও শোষকশ্রেণীর সম্পর্ক, শোষণের বিভিন্ন ধারা ও সমাজজীবনে বিভিন্নরূপে তার উপস্থিতি, জনগণের সঙ্গে শোষণের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, তার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী সমাধান, মুক্তির পথ, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা, বিভিন্ন স্থানীয় অভিযোগ সমস্যা ও তার সঠিক সমাধান, জনগণকে সেবা করার মত মহান শিক্ষা ও মনোবৃত্তি শত্রুর আক্রমণ থেকে জনগণকে এবং নিজেকে রক্ষা করার মত কলা-কৌশল স্থানীয় জনগণের কৃষি-শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে নানা শিক্ষামূলক উপদেশ সম্বন্ধে। এই ধরণের প্রচারের জন্য সঠিক নির্বাচিত আলোচনা চালাতে হবে। প্রচারককে হতে হবে ধীর ও স্থির এবং অসীম ধৈর্যশীল। স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তাঁকে মনোযোগ সহকারে সব শুনতে হবে এবং সঠিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। জটিল পরিস্থিতি সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতৃত্বের দৃষ্টিগোচরে আনতে হবে। তাছাড়া এই ইউনিটের আর একটি দিক হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে এলাকার সম্প্রসারণের দিকে প্রত্যক্ষ উদ্যোগ নেয়া, কারণ রাজনৈতিকভাবে এলাকা দখল করা ও সেখানের জনগণের রাজনৈতিক সচেতন করে সেখানে গেরিলাবাহিনী তৈরী করাই চচ্ছে গেরিলাদের আশু লক্ষ্য। সুতরাং প্রচার ব্যবস্থার দিকে যথাযথ গুরুত্বও দেওয়া অতি আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয়। প্রচার বিভাগ নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে অবশ্যই স্থানীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(৫) স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা: স্থানীয় এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও উৎপাদন ব্যবস্থা নির্বিঘ্নে রাখার জন্য, জনগণকে শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা আবশ্যকীয় প্রয়োজন। অভিযুক্তের বিচার গণআদালতেই সম্পন্ন হবে। গণ-আদালত ঐ এলাকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে। অবশ্যই জনগণের পক্ষ থেকে স্থানীয় সাংগঠনিক নেতৃত্ব এই গণ-আদালতের মনোনীত সদস্য। এই গণ-আদালতে অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারীকে খোলাখুলি তাঁদের সকল কথা বলতে দিতে হবে। যে কোন লোক ন্যায়সঙ্গত ভাবে যে কোন পক্ষ অবলম্বন করে সত্য সাক্ষী দিতে পারবে।

মিথ্যা সাক্ষী দাতাকেও (প্রমাণিত হলে) গণ-আদালত যে কোন দণ্ড দানের (মৃত্যুদণ্ড সহ) ক্ষমতা রাখে। জনগণের সম্মতি নিয়ে গণ-আদালতের রায়ই শেষ রায়। এ রায়কে লঙ্ঘন করার অধিকার কারো নেই। স্থানীয় প্রশাসনের জন্য গণ-আদালত নিয়ন্ত্রিত গণরক্ষী বাহিনী সৃষ্টি করা হবে। এরা জনগণের সম্পদ ও জনগণের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। এরাও সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। এরাই পরবর্তীকালে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেবার প্রাথমিক মনোনয়ন লাভ করবেন। রাজনৈতিক চেতনার অভাবে এদের অধিকার থাকবে সীমিত। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন অভিযুক্তের প্রতি এরা অসম্মানযুক্ত আচরণ করতে পারবেন। এধরণের যে কোন ব্যবহারের জন্য তাদের কঠোর সাজা দেয়া হবে।

(৬) মুক্তাঞ্চলে কৃষি-কর্ম : স্থানীয় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে গেরিলা যোদ্ধা সহ সকল স্থানীয় জনগণের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই এ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে। গেরিলাদের প্রচার ইউনিটগুলো প্রয়োজনবোধে এজন্য কৃষকদের সঙ্গে জমিতে শারীরিক শ্রম বিনিয়োগ করবে, অকৃষকদের জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। কোন জমি পতিত রাখা যাবেনা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি কারো রাখা চলবেনা (এই প্রয়োজন নির্ধারণ করবে স্থানীয় সাংগঠনিক নেতৃত্ব গণ-আদালতের সদস্য সহ সকল জনগণ)। কৃষিকর্মে সমবায় প্রথার প্রবর্তনের মাধ্যমে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

মাঝে মাঝে কৃষকদের উন্নতধরণের কৃষিপ্রণালী সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে হবে এবং বিভিন্ন কৃষকদের উৎপাদনের তথ্য ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কৃষকদের কাছ থেকে শিখতে হবে এবং কৃষকদের শেখাতে হবে। এটাই হবে গেরিলাদের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ম যা দ্বারা সমস্ত অভিজ্ঞতার সার সঙ্কলন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরো উন্নত প্রথায় চাষাবাদ করার প্রক্রিয়া বের করা যাবে। কারণ প্রতিটি মুক্তাঞ্চলকে অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পশুপক্ষী পালন কৃষিকর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। উপযুক্ত যত্ন নিয়ে এই পশুপক্ষী পালনের দিকে যথাযথ নজর দিলে কালক্রমে খাদ্য সমস্যার

অনেকটা সমাধান সম্ভব হতে পারে। আমাদের দেশে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ও ঘোড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশুই প্রধান এবং এদের পালন করাও সহজসাধ্য। যৌথ প্রচেষ্টায় এই পশুপালনের বিকাশ ঘটানো আরো সহজ। গৃহপালিত পোষা পাখীদের মধ্যে মুরগী ও হাঁসই প্রধান। হাঁস-মুরগীর চাষ পূর্ব বাংলার প্রতি ঘরে ঘরেই হয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ভাবে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় এদের চাষ মুক্তাঞ্চলে খাদ্যসামগ্রী পূরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া পূর্ব বাংলার বিস্তৃত ঝোপ ঝাড় ও জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে বক বালিহাঁস, মেটে হাঁস, বুনোহাঁস, বনমুরগী, কাদেম, ডাহুক, ঘোয়েল, হরিয়াল, কাকতুয়া, ময়না, শালিক, চড়ুই ইত্যাদি হাজারো ধরনের পাখী পাওয়া যায়। মুক্তাঞ্চলের জনগণ প্রয়োজন হলে এসব পাখীর সুস্বাদু মাংসেই ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করবেন।

পূর্ব বাংলা নদীমাতৃক দেশ। সারাটি দেশে জুড়ে রয়েছে অসংখ্য নদী নালা খাল, বিল, ডোবা, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়। এ সকল জলাশয়ে উৎপন্ন প্রচুর মৎস্যও মুক্তাঞ্চলের খাদ্য সমস্যা সমাধানের অন্যতম একটি উপকরণ হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু প্রকৃতির উপরে গেরিলা ও মুক্তাঞ্চলের বাসিন্দাদের নির্ভর করলে চলবেনা। সুবিধামত নীচু জায়গায় বাঁধ দিয়ে এবং প্রতিটি পুকুরকে যৌথ পরিশ্রমের মাধ্যমে খনন করে যৌথভাবেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের চাষ করতে হবে। মৎস্য পূর্ব বাংলার জনগণের একটি প্রধান খাদ্য, সুতরাং মৎস্য চাষের দিকে বেশী করেই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

মুক্তাঞ্চলের কৃষকরা মাঝে মাঝে এই কৃষিকর্মের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য আলোচনা সভা ডাকবেন। সেখানে পালাক্রমে প্রচার বিভাগে অবস্থানরত গেরিলারা অবশ্যই যোগ দেবেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা ধৈর্যসহকারে শুনবেন। সকলের অভিজ্ঞতার সার সঙ্কলন করে বৈজ্ঞানিক প্রথায় আরো উৎপাদন কি করে বাড়ানো যায় সে প্রচেষ্টা চালাবেন। মনে রাখতে হবে স্বনির্ভরশীল উৎপাদন ব্যবস্থা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও জয়লাভের একটি মূল শর্ত এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম একটি মূল কথা।

(৭) মুক্তাঞ্চলে শিল্পকর্ম : গেরিলা বাহিনীর দখলীকৃত এলাকায় শিল্প গড়ে তোলা কঠিন, তবু নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষ ক্ষুদ্র

অঞ্চলে সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কৃষি কর্মের ফাঁকে ফাঁকে কৃষকদের প্রচুর অবসর, সেই অবসর সময় অলসভাবে বসে না কাটিয়ে সামান্য পরিশ্রম করেই বিভিন্ন কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য চাই উদ্যোগ, উৎসাহ, প্রেরণা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সেবা করার মনোবৃত্তির মত মৌলিক মানবিক গুণসমূহের যথাযথ সমন্বয়। স্থানীয় সংগঠনিক নেতৃত্ব ও গেরিলা প্রচার বিভাগকেই স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এ সকল মানবিক গুণগুলির বিকাশ ঘটানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় কুটিরশিল্প হিসাবে চরকা কাটা সূতা, তাঁতে বোনা মোটা কাপড়, বাঁশ নির্মিত বিভিন্ন ধরণের পাত্র, বিভিন্ন মৃৎপাত্র, সাবান, দিয়াশলাই, কাপড়ের ঝোলা, বিছানা, কৃষিকর্মের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, চর্মনির্মিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি, অন্যান্য সামরিক দ্রব্যাদি, বিভিন্ন ধরণের ফাঁদ, গ্রাম্য টোটকা ঔষধাদি (অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত) ইত্যাদি অতি সহজেই তৈরী করা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে প্রতিটি রাজনৈতিক সচেতন গেরিলা ও স্থানীয় সাংগঠনিক নেতৃত্বকে সর্বদাই সৃজনশীল যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। যৌথ উৎপাদনের সুবিধা অনেক—(১) শ্রম বিভক্তির ফলে অধিক হারে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অধিক হারে উৎপাদিত দ্রব্যের মানোন্নয়ন, (২) পরস্পরের প্রতি শোষণের অবসান, ফলে পস্পরের প্রতি দ্বন্দ্ব নিরসন এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট পদক্ষেপ। তা ছাড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থায়ই বিশ্বাসী।

(৮) মুক্তাঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা : শিক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তবে অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষাকে বা অন্য কোন উপায়ে শিক্ষাগ্রহণ করাকে তাঁরা কখনোই অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। অধ্যয়নের পথকে প্রশস্ত করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে এবং তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালাতে হবে। তবে যে কোন মূল্যে বর্তমানে প্রচলিত ঔপনিবেশিক-সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল উৎপাটন করতে হবে এবং সেই স্থানে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত গণমুখী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। এই ব্যাপারে সকল উদ্যোগ নিতে হবে গেরিলাদের। এই প্রচেষ্টার ফল সুদূরপ্রসারী। কারণ বর্তমান শিক্ষা

ব্যবস্থার বিপুপ্তি না ঘটাতে পারলে মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করার পরেও, বিপ্লবে জয়যুক্ত হওয়ার পরেও নব নব সংশোধনবাদের জন্ম হবে এবং পরিণামে বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হবে। তাই এখন থেকেই গুরুত্ব সহকারে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কাজে গেরিলাদের সক্রিয় ভাবে কাজ করে যেতে হবে।

মুক্তাঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ সুযোগ্য চিকিৎসক, ঔষধপত্র ও বিভিন্ন চিকিৎসা বিষয়ক যন্ত্রপাতির অভাবে মুক্তাঞ্চলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু আহত ও পীড়িতদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই প্রতিটি মুক্তাঞ্চলে একটি করে চিকিৎসা বিভাগ জরুরী এবং অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে থাকতে হবে। চিকিৎসা বিভাগে অন্ততঃ একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার, তার কয়েকজন সহকারী, কম্পাউণ্ডার, নার্স থাকবেন। নার্স ও কম্পাউণ্ডার না পাওয়া গেলে উক্ত ডাক্তারকেই স্থানীয় এলাকার উৎসাহী ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে তাঁর সহকর্মী দল তৈরী করে নেবেন। যুদ্ধ চালাতে গিয়ে যে কোন গেরিলা আহত হয়ে পড়তে পারে. এমনও দেখা গেছে উপযুক্ত সময়ে সামান্য চিকিৎসাতেই গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি বেঁচে গেছেন, আবার সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথোপযুক্ত সময়ে শুধুমাত্র চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাছাড়া কঠোর পরিশ্রম অনিয়মিত অপুষ্টিকর খাওয়া দাওয়ার জন্যও জনগণের মধ্যে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। এমতাবস্থায় এই আর্তপীড়িত জনতা ও গেরিলাকে সুস্থ করে তোলার জন্যই জরুরী হিসাবেই চিকিৎসা বিভাগকে স্থান দিতে হবে। সাধারণ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতিগুলি নিকটস্থ যে কোন শহর থেকে সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজনীয় :—

(১) ক্ষত পরিষ্কার করার জন্য—Distilled water, Saline water, Spirit, Alcohal, Dettol.

(২) ক্ষতস্থানে Antiseptics হিসাবে Tn. Iodine, Tn. Benzoine, Sulphanitamide powder, এবং অন্যান্য Antibiotics.

(৩) ক্ষতস্থান বাঁধার জন্য—তুলা, গজ (অভাবে সাদা কাপড় ক্লোরিনযুক্ত বা সামান্য লবণযুক্ত পানিতে ফুটিয়ে নিয়ে) ব্যাণ্ডেজ, Leuko-plast ইত্যাদি।

(৪) ক্ষতস্থান অপারেশনের পূর্বে অবশ করার জন্য—বিভিন্ন Local

Anaesthetics—যথা Procane, Lignocane, cocane Solution, monocane, spirit, Ether, Alcohol সিরিঞ্জ, নিডল ইত্যাদি। (General Anaesthetia পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল ছাড়া সম্ভব নয়)

(৫) ক্ষতস্থান কেটে দূষিত পদার্থ বের করার জন্য অপারেশনে দু তিনটি টর্চলাইট, ফুটন্ত পানিতে বিশুদ্ধ কয়েক জোড়া Stainless Steel নির্মিত কাঁচি, Forceps, Scalpals, বিভিন্ন আকৃতির Surgical blades, Arterial farceps, হাতে পরার গ্লবস, বিভিন্ন ধরণের ট্রে।

(৬) ক্ষতস্থান সেলাই করার জন্য—Surgical needles, মোটা, মাঝারি ও সরু নাইলন সূতা, ক্যাডগাট, Needle holder, forceps এবং কাঁচি ইত্যাদি।

(৭) রক্তপাত বন্ধ করার জন্য—Adrenaline, Nor-adrenaline, Coagulen Ciba Trostin "M" ইত্যাদি Veso constricter ও coagulent Substance.

(৮) ব্যথা কমানোর জন্য :—Asperin, A. P. C., Aspro, Disprin, Emperin-s ইত্যাদি।

(৯) জ্বর ফুলা (Inflamation) ও ব্যথা কমানোর জন্য—Codrol, Pharmapyrin, Sulphadizine, Penoden, Novalgin, Madribon, Arcosulph ইত্যাদি।

(১০) অসহ্য ব্যথা কমাবার এবং ঘুমের জন্য—Gardanal Sodium, (Phenobarbitone) Marphine, Pathedine, এবং অন্যান্য Tranquilizers--Valium, Largatil ইত্যাদি।

(১১) ধনুষ্টঙ্কার (টিটেনাস) ও পচনশীল ক্ষত (গ্যাংরিন) প্রতিরোধে যথাক্রমে Inj.—A.T.S. ও Inj A.G.S. ; কলেরা, টাইফয়েড ও প্যারা টাইফয়েড প্রতিরোধে T.A.B.C. Vaccine, বসন্ত প্রতিরোধে টিকা ও যক্ষা প্রতিরোধে B.C.G, Vaccine.

(১২) ক্ষতের ঘা শুকাবার জন্য—Sulphanihamide Powder, Iodine, Benzine, ও অন্যান্য Antibiotics Penecilline ; Streptomycin এবং এই দুইএর সংমিশ্রণ—Combiotics, strepto-Penecilline, Penistrep Seclomycin, omnamycin ইত্যাদি), Terramycin, Tatracycline, chloromycetine ইত্যাদি। (এই সঙ্গে Vitamin "c" ও দেওয়া প্রয়োজন।

(১৩) কোন Reaction বা Allergic manifestation দেখা দিলে—Phenargon, Actidil, Preactine ইত্যাদি অন্যান্য Antihistaminic drugs.

(১৪) হার্ট ফেইল বা অজ্ঞানে—Nikethamide (coramine) এবং অন্যান্য এই জাতীয় ঔষধ।

(১৫) বিভিন্ন পেটের পীড়ায়—Carminative Mixture, Sulphaguanadine, Entox, Enteroguanadine, Enterolin, Enterovi-of-Form, এমনকি চিরতার জল ও কালমেঘ জাতীয় আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও অন্যান্য গ্রাম্য ঔষধ যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে সর্ব প্রকারের ভিটামিন।

(১৬) সাধারণ সর্দিজ্বর ও কাশিতে—Mixture Sodi-Selisiline, Sulphadixine, Sulphatried, Expectorents, বিভিন্ন Cough Syrup ইত্যাদি।

(১৭) তাছাড়া চক্ষু-কর্ণ ও চর্মরোগের মলমজাতীয় বিভিন্ন নির্দিস্ট ঔষধসমূহ।

(১৮) এসকল ঔষধ ছাড়াও রোগ পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ডাক্তারী যন্ত্রপাতি যথা—Stethoscope, Shigmomenometer Pressure পরিমাপক যন্ত্র), Thermometer, 2cc, 5cc ও 50cc বিভিন্ন আকারের রাবার টিউব, মাস্ক, গ্লবস এবং সম্ভব হলে মা ও অন্যান্য প্যাথোলোজিক্যাল যন্ত্রপাতি প্রতিটি মুক্তাঞ্চলে সমা প্রয়োজনীয়।

স্থানীয় এলাকার জনস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য চিকিৎস নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় জনগণের মধ্যে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে দেবার প্রচেষ্টা করবেন। এতে জনগণেয় সঙ্গে তাদের গণস পাবে এবং জনগণের সঙ্গে তাদের সুখ দুঃখ কষ্ট একাত্ম হয়ে মি পথ প্রশস্ত হবে; জনস্বাস্থ্য সংরক্ষিত হবে। এই উদ্দেশ্যে অন্তর বাধ্যতামূলকভাবে গেরিলাদিগকে ও স্থানীয় জনগ A.C.S., T.A.B.C., Vaccine, বসন্তের টিকা এবং B.C.G প্রয়োজন।

(১০) **মুক্তাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা:** মুক্তাঞ্চ গতভাবে সুপ্রশস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন আবশ্যকীয়

সরু জঙ্গলপূর্ণ গোপন পথই মুক্তাঞ্চলে গেরিলাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখবে। মুক্তাঞ্চলে কৌশলগত কারণেই কোন ঝোপঝাড় বা গাছপালা কাটা উচিত হবে না। মুক্তাঞ্চল যত ঝোপঝাড়পূর্ণ ও দুর্গম হবে ততই তা গেরিলাদের জন্য সুবিধাজনক এবং শত্রুদের জন্য অসুবিধাজনক হবে। তাছাড়া গেরিলা অঞ্চলের চতুস্পার্শ্বে নানাপ্রকার গোপন ফাঁদ পেতে রাখতে হবে যাতে শত্রু সহজে মুক্তাঞ্চলে আসতে না পারে বা ঐ অঞ্চলের কোন শষ্য গো-মহিষাদি অপহরণ করতে না পারে। কিন্তু বহিরাঞ্চলের সঙ্গে যাতে মুক্তাঞ্চলে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। বিশেষ করে এক মুক্তাঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য মুক্তাঞ্চলের বা রাজনৈতিক সংগঠনের জেলা বা কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যথাযথ সংযোগ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন মুক্তাঞ্চলে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হলে সেই স্থানের গেরিলা কমরেড এমনকি বহু সাধারণ জনগণকেও সাময়িকভাবে আশ্রয় দিতে হবে। কোন এলাকার গেরিলাদের দুর্দিনে দুহাত বাড়িয়ে অন্যান্য এলাকার গেরিলাদের এগিয়ে আসাই হবে কমরেডসুলভ কাজ। এ কাজ শুধু গেরিলাদের আবশ্যকীয় কর্তব্যই নয়, পবিত্রতম দায়িত্বও বটে।

Phenol যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নিজেদের রসদপত্র শত্রুর কবল থেকে Arcosথার জন্য প্রয়োজন হলে মাটির নীচে পরিখা খনন করে, (১০) ী তৈরী করে এবং গোপন সুড়ংগ পথের মাধ্যমে মুক্তাঞ্চলের (Phenol এবং মুক্তাঞ্চলের বাইরে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন ও lizers--V করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে গেরিলারা (১১) ধনুর্ণকারী শত্রুসেনাদের গোলা ও বোমাবর্ষণের হাত থেকে যথাক্রমে ! করতে সক্ষম হবে। তাছাড় :স্থানীয় এলাকার ভৌগোলিক টাইফয়েড/সারেই গেরিলারা তাঁদের যোগ্য উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে যক্ষ্মা প্রতিতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হবে।

(১২) **ঐক্যফ্রন্ট ও সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে মুক্তি :**

Iodine, B কোন কোন স্থানীয় এলাকায় মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করা সম্ভব এবং এই ভাবে দেশের সমগ্র মেহনতী জনগণকে এই 'মুক্তিযুদ্ধে Penistrep না পারলে, পূর্ব বাংলার সকল জেলায়, সকল মহকুমায়, Tatracycline নাঞ্চল সৃষ্টি করতে না পারলে সামগ্রিক ভাবে পূর্ব বাংলার দেওয়া প্রয়োসম্বিত হবে। এমন কি পর্যুদস্ত হয়ে যাবারও সম্ভাবনা

থাকে। এ সমস্যার সমাধান করতে হবে একমাত্র রাজনৈতিক উপায়ে। মেহনতী জনগণের পার্টি মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী নেতৃত্বে এক অঞ্চলের বিপ্লবী জনগণের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বিপ্লবী জনগণের বিপ্লবী ঐক্যফ্রন্ট গড়ে উঠবে; ঐক্যবদ্ধ হবে পূর্ব বাংলার সমগ্র সংগ্রামী জনতা; সুনির্ধারিত ভাবে শত্রুসৈন্য হবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত; বিজয়ী হবে পূর্ব বাংলার বীর বিপ্লবী জনগণ। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী নেতৃত্বে এভাবেই দেশী ও বিদেশী সকল শোষক শত্রুর শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবে জনগণ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজব্যবস্থার সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন পূর্ব বাংলা।